SUBJECTS OF EXAMINATION

IN THE

BENGALI LANGUAGE,

APPOINTED BY THE

Senate of the Calcutta University.

FOR THE

ENTRANCE EXAMINATION OF 1889.

CALCUTTA.

PRINTED AND PUBLISHED BY B. L. CHAKRAVARTI,

AT THE NEW SCHOOL-BOOK PRESS.

8, Dixon's Lane.

1888.

মহাভারত

তৃতীয় অধ্যায়—পৌষ্যপর্ব্ব।

একদা পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় মৃগয়ায় গমন করিয়া নিজরাজ্যান্তর্গত কোন জনপদে এক আশ্রম দর্শন করিলেন। তথায় শ্রুতশ্রবাঃ নামে এক ঋষি বাস করিতেন। তাঁহার সোমশ্রবা নামে তপস্যানুরক্ত পুত্র ছিলেন। জনমেজয় তাঁহার সেই পুত্রের নিকটে গিয়া তাঁহাকে পৌরাহিত্যে বরণ করিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া ঋষির নিকট নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আপনকার এই পুত্র আমার পুরোহিত হউন। ঋষি রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, আমার এই পুত্র মহাতপস্বী, সদা স্বাধ্যায়রত, মদীয় তপোবীর্য্যসম্পন্ন, মহাদেবশাপ ব্যতিরেকে অন্যান্য সমুদায় শাপ-নিরাকরণে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ইহাঁর এই এক নিগূঢ় ব্রত আছে, যে ব্রাহ্মণে ইহাঁর নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, ইনি তাহাই দেন; ইহাতে যদি তোমার সাহস হয়, ইহাঁকে লইয়া যাও। জনমেজয় শ্রুতশ্রবার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! ইহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। অনন্তর তিনি সেই পুরোহিত সমভিব্যাহারে রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া, নিজ ভ্রাতাদিগকে কহিলেন, ইনি যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে, কোন মতে অন্যথা না হয়। ভ্রাতৃগণ তদীয় আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। জনমেজয় ভ্রাতাদিগকে এইরূপ আদেশ দিয়া, তক্ষশিলা-জয়ার্থে প্রস্থান করিলেন, এবং অবিলম্বে সেই দেশ আপন বশীভূত করিলেন।

এই অবসরে প্রসঙ্গক্রমে উপাখ্যানান্তর আরম্ভ হইতেছে। আয়োদধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার উপমন্যু, আরুণি ও ধৌম্য নামে তিন শিষ্য। তিনি পাঞ্চালদেশীয় আরুণি নামক শিষ্যকে ক্ষেত্রের আলি বন্ধন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। পাঞ্চাল্য আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে তথায় গমন করিলেন, কিন্তু আলি বন্ধন করিতে পারিলেন না। তিনি বিস্তর

ক্লেশ স্বীকার করিয়াও কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পরিশেষে এক উপায় দেখিয়া স্থির করিলেন ভাল ইহাই করিব। এই নিশ্চয় করিয়া তিনি সেই কেদারখণ্ডে শয়ন করিলেন। শয়ন করাতে জলনির্গম নিবারিত হইল। পরে উপাধ্যায় আয়োদধৌম্য শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, পাঞ্চাল্য আরুণি কোথায় গেল। তাঁহারা বিনীত বচনে উত্তর করিলেন, ভগবন্! আপনি তাহাকে ক্ষেত্রের আলিবন্ধনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ঋষি শিষ্যদিগকে কহিলেন, তবে চল আমরা সকলেই সেখানে যাই। অনন্তর তিনি তথায় গমন করিয়া এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, অহে বৎস পাঞ্চাল্য আরুণি! তুমি কোথায় আছ, আইস। আরুণি উপাধ্যায়-বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা সেই কেদারখণ্ড হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন, মহাশয়! আমি উপস্থিত হইয়াছি, কেদারখণ্ড হইতে যে জল নির্গত হইতেছিল, অবারণীয় হওয়াতে তাহা রোধ করিবার নিমিত্ত তথায় শয়ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনকার শব্দ শুনিয়া সহসা কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া আপনকার নিকটে উপস্থিত হইলাম, অভি-বাদন করি, এক্ষণে কি করিব, আজ্ঞা করুন। শিষ্যবাক্যাবসানে উপাধ্যায় তদীয় গুরুভক্তির দৃঢ়তাদর্শনে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন বৎস! তুমি কেদারখণ্ডের আলি বিদীর্ণ করিয়া উত্থান করিয়াছ, অতএব তুমি অদ্যাবধি উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইবে; আর আমার বাক্য প্রতিপালন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার মঙ্গল হইবে, বেদ ও সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল স্মরণপথারূঢ় থাকিবেক। আরুণি এইরূপ উপাধ্যায়বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত দেশে প্রস্থান করিলেন।

আয়োদধৌম্যের উপমন্যু নামে আর এক শিষ্য ছিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে, বৎস উপমন্যু তুমি গো রক্ষা কর, এই আদেশ দিয়া গোচারণে প্রেরণ করিলেন। তিনি উপাধ্যায়বচনানুসারে গো রক্ষা করিতে লাগিলেন। উপমন্যু দিবাভাগে গো রক্ষা করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক উপাধ্যায়ের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে স্থূলকলেবর অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস উপমন্যু! তোমাকে বিলক্ষণ স্থূলকায় দেখিতেছি, তুমি কি আহার করিয়া থাক? তিনি উত্তর

করিলেন, ভগবন্! ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা উদরপূর্ত্তি করি। উপাধ্যায় কহিলেন, অতঃপর আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিবে না। উপমন্যু এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সংগৃহীত ভিক্ষান্ন আনিয়া উপাধ্যায়ের নিকট সমর্পণ করিলেন। উপাধ্যায় সমস্ত ভিক্ষান্ন স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। পর দিন উপমন্যু দিবাভাগে গো-রক্ষা করিয়া প্রদোষকালে গুরুকুলে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গুরুর পুরোভাগে অবস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় এক্ষণেও তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস উপমন্যু! আমি তোমার সমুদায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি এখন তুমি কি আহার কর। উপমন্যু নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি আপনাকে প্রথম ভিক্ষা সমর্পণ করিয়া আর একবার ভিক্ষা করি, তাহাতে যাহা পাই তাহাই আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করি। উপাধ্যায় কহিলেন, ইহা গুরুকুলবাসীর ধর্ম্ম নহে; তুমি অন্যান্য ভিক্ষাজীবীর বৃত্তি প্রতিরোধ করিতেছ, এবম্প্রকারে জীবিকানির্ব্বাহ করাতে তোমার লোভিত্ব প্রকাশ পাইতেছে; অতঃপর তুমি দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করিও না। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গো রক্ষা করিতে লাগিলেন। এক দিবস তিনি গোরক্ষান্তে উপাধ্যায় গৃহে আগমন করিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন করিলেন। উপাধ্যায় এখনও তাঁহাকে স্থূল দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন বৎস উপমন্যু! আমি তোমার সমুদায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি, আর তুমি ভিক্ষা কর না, তথাপি তোমাকে বিলক্ষণ স্থূলকায় দেখিতেছি; অতএব, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল। এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উপমন্যু নিবেদন করিলেন মহাশয়! এই সকল ধেনুর দুগ্ধপান করিয়া প্রাণ ধারণ করি। উপাধ্যায় কহিলেন আমি তোমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই, তোমার এরূপে দুগ্ধপান করা কোন রূপেই ন্যায্য নহে। উপমন্যু, আর এরূপ করিব না বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং গোরক্ষান্তে যথাকালে উপাধ্যায়গৃহে আগমন করিয়া গুরুসম্মুখে দাণ্ডাইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় এখনও তাঁহাকে স্থূলকলেবর অবলোকন করিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যু! ভিক্ষান্ন ভক্ষণ কর না, বারান্তরও ভিক্ষা কর না, দুগ্ধও পান কর না; তথাপি তোমাকে স্থূলকায় দেখিতেছি। অতএব, এখন কি আহার করিয়া থাক, বল। উপমন্যু এইরূপ আদিষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন, মহাশয়! বৎসগণ স্ব স্ব

মাতৃস্তন পান করিতে করিতে যে ফেন উদ্গার করে, তাহাই পান করিয়া থাকি। উপাধ্যায় কহিলেন সুশীল বৎস সকল তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদ্গার করে; ফেনপানে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি বৎসগণের আহারের ব্যাঘাত করিতেছ; অতএব তোমার ফেনপান করা উচিত নহে। উপমন্যু আর করিব না বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া, পর দিন প্রভাতে গোরক্ষায় প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে প্রতিষিদ্ধ হইয়া উপমন্যু ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করেন না, বারান্তরও ভিক্ষা করেন না, দুগ্ধপান করেন না, দুগ্ধের ফেনও উপভোগ করেন না। এক দিবস অরণ্যে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন। ঐ সকল ক্ষার, তিক্ত, কটু, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ অর্কপত্র অভ্যবহার করাতে চক্ষুর দোষ জন্মিয়া অন্ধ হইলেন; এবং অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কূপে পতিত হইলেন। সূর্য্যদেব অস্তাচলাবলম্বী হইলেন, উপাধ্যায় তথাপি তাঁহাকে অপ্রত্যাগত দেখিয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন, উপমন্যু কেন আসিতেছে না। তাঁহারা কহিলেন সে গোরক্ষা করিতে গিয়াছে। উপাধ্যায় কহিলেন, আমি উপমন্যুর সর্ব্বপ্রকার আহার প্রতিষেধ করিয়াছি, সে কুপিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; এই নিমিত্তই, এত বিলম্ব হইল তথাপি আসিতেছে না; অতএব তাহার অন্বেষণ করা উচিত। এই বলিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অরণ্য প্রবেশ পুরঃসর এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, বৎস উপমন্যু! কোথায় আছ, শীঘ্র আইস। উপমন্যু উপাধ্যায়বাক্য শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে উত্তর প্রদান করিলেন, আমি কূপে পতিত হইয়াছি। উপাধ্যায় কহিলেন, কূপে পতিত হইলে কেন? তিনি কহিলেন অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্ধ হইয়াছি, তাহাতেই কূপে পতিত হইলাম। উপধ্যায় কহিলেন দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারযুগলের স্তব কর, তাঁহারা তোমাকে চক্ষুঃ প্রদান করিবেন।

উপমন্যু উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে ঋগ্বেদবাক্যদ্বারা অশ্বিনীতনয়দ্বয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন, হে অশ্বিনীকুমারযুগল! তোমরা সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলে, তোমরাই সর্ব্বজীবপ্রধান হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলে, তোমরাই পরে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিচিত্র সংসারপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশমান হইয়াছ, দেশ কাল অবস্থা দ্বারা তোমাদের পরিচ্ছেদ করা যায় না, তোম-

রাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে সর্ব্বকাল বিরাজমান রহিয়াছ, তোমরাই পক্ষিরূপে শরীরবৃক্ষে অধিষ্ঠান করিতেছ, তোমরা সৃষ্টিবিষয়ে পরমাণু পরতন্ত্র বা প্রকৃতিসাপেক্ষ নহ।

অশ্বিনীকুমারেরা উপমন্যুর এইরূপ স্তবে তুষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি এবং অপূপ দিতেছি ভক্ষণ কর। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু নিবেদন করিলেন, আপনারা যাহা কহেন কদাচ তাহার অন্যথা হয় না, কিন্তু আমি গুরুর নিকট নিবেদন করিয়া অপূপ ভক্ষণ করিতে পারি না। তখন আশ্বিনেয়েরা কহিলেন, পূর্ব্বে আমরা তোমার উপাধ্যায়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক অপূপ দিয়াছিলাম, তিনি গুরুর নিকট নিবেদন না করিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন; অতএব তোমার উপাধ্যায় যেরূপ করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ কর। ইহা শুনিয়া উপমন্যু কহিলেন, আমি আপনাদিগকে বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, আমি গুরুদেবকে না জানাইয়া অপূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না। তদনন্তর অশ্বিনীকুমারেরা কহিলেন আমরা তোমার এইরূপ অবিচলিত গুরুভক্তি দর্শনে সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম; তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত সকল লৌহময়, তোমার দন্তসকল হিরণ্ময়; তুমি চক্ষুষ্মান্ ও শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে।

উপমন্যু, অশ্বিনীকুমারবরপ্রভাবে নয়নলাভ করিয়া উপাধ্যায়সমীপে আগমন ও অভিবাদনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন করিলেন। তিনি শুনিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন অশ্বিনীতনয়েরা যেরূপ কহিয়াছেন, তুমি সেইরূপ সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে, সকল দেব ও সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল তোমার স্মরণপথারূঢ় থাকিবে। উপমন্যুর এই পরীক্ষা হইল।

আয়োদধৌম্যের বেদ নামে আর এক শিষ্য ছিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন, বৎস বেদ! আমার গৃহে থাকিয়া কিছুকাল শুশ্রূষা কর, তোমার মঙ্গল হইবে। তিনি যথা আজ্ঞা বলিয়া গুরুশুশ্রূষাতৎপর হইয়া দীর্ঘকাল গুরুগৃহে অবস্থিতি করিলেন। গুরু তাঁহাকে সর্ব্বদাই কার্য্যের ভার দিতেন। তিনি শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণাজনিত সমস্ত ক্লেশ সহিতেন এবং আদেশ পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেন, কখন কোন বিষয়ে অনিচ্ছা বা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না। বহুকালের পর গুরু তাঁহার প্রতি

প্রসন্ন হইলেন। তদীয় প্রসাদে বেদ, শ্রেয়ঃ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। বেদেরও এই পরীক্ষা হইল।

বেদ উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া গুরুকুল হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারও গৃহাবস্থানকালে তিন শিষ্য হইল। তিনি শিষ্যদিগকে গুরুশুশ্রূষা বা কোন কর্ম্ম করিতে কহিতেন না। স্বয়ং গুরুকুলবাসের দুঃখাভিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য শিষ্যদিগকে কখন কোন প্রকার ক্লেশ দিতে চাহিতেন না।

কিয়ৎকাল পরে রাজা জনমেজয় ও পৌষ্য বেদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে উপাধ্যায়ের কার্য্যে বরণ করিলেন। তিনি যাজনকার্য্যোপলক্ষে প্রস্থানকালে উতঙ্ক নামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন বৎস! আমার অনুপস্থিতিকালে গৃহে যে কোন বিষয়ের অসংস্থান হইবে তুমি তাহা সম্পন্ন করিবে। বেদ উতঙ্ককে এইরূপ আদেশ দিয়া প্রবাসে প্রস্থান করিলেন। উতঙ্ক গুরুগৃহে থাকিয়া অসাধারণ ও অবিচলিত ভক্তি সহকারে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহপ্রত্যাগমনপূর্ব্বক উতঙ্কের অবিচলিত গুরুভক্তির পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন এবং কহিলেন বৎস উতঙ্ক! তোমার কি অভীষ্টসম্পাদন করিব বল, তুমি ধর্ম্মতঃ আমার শুশ্রূষা করিয়াছ, তাহাতে আমাদের পরস্পর প্রীতি বৃদ্ধি হইল; এক্ষণে আমি তোমাকে গৃহগমনের অনুজ্ঞা করিতেছি, তোমার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে; প্রস্থান কর।

এইরূপ গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া উতঙ্ক নিবেদন করিলেন, আপনকার কি প্রিয়সম্পাদন করিব আজ্ঞা করুন। এরূপ আপ্তশ্রুতি আছে, যে ব্যক্তি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া অধ্যাপনা করেন, এবং যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগের অন্যতরের মৃত্যু হয় অথবা পরস্পরের বিদ্বেষ জন্মে। অতএব আপনার অনুজ্ঞা লইয়া অভিমত গুরুদক্ষিণা আহরণের বাসনা করি। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! অপেক্ষা কর, বলিব। কিয়দ্দিন পরে উতঙ্ক উপাধ্যায়ের নিকট নিবেদন করিলেন মহাশয় আজ্ঞা করুন, কিরূপ গুরুদক্ষিণা দিলে আপনকার মনঃ-

প্রীতি হইতে পারে। উপাধ্যায় কহিলেন বৎস উতঙ্ক! কিরূপ গুরুদক্ষিণা আহরণ করিব বলিয়া আমাকে সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করিয়া থাক; অতএব তোমার উপাধ্যায়ানীর নিকটে গিয়া, কি আহরণ করিব বলিয়া, জিজ্ঞাসা কর, তিনি যাহা কহেন, তাহাই আহরণ কর। এইরূপ গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া উতঙ্ক উপাধ্যায়ানী সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন ভগবতি! উপাধ্যায় আমাকে গৃহগমনের অনুমতি দিয়াছেন; এক্ষণে আমার এই বাসনা, আপনকার অভিমত গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া ঋণমুক্ত হইয়া গৃহ প্রস্থান করি; অতএব আজ্ঞা করুন, কি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিব। উপাধ্যায়ানী কহিলেন বৎস! পৌষ্য রাজার নিকটে যাও; তাঁহার সহধর্ম্মিণী যে দুই কুণ্ডল ধারণ করিয়াছেন তাহাই প্রার্থনা করিয়া আন; চতুর্থ দিবসের ব্রত-নিবন্ধন উৎসব হইবে, সেই দিন ঐ দুই কুণ্ডল পরিয়া শোভমানা হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেশন করিব; ইহাই সম্পন্ন কর, ইহা করিলেই তোমার সকল মঙ্গললাভ হইবে, নতুবা তোমার মঙ্গল নাই।

উতঙ্ক এইরূপে উপাধ্যায়ানী কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পথে গমন করিতে করিতে এক মহাকায় বৃষভ ও তদুপরি আরূঢ় এক মহাকায় পুরুষ অবলোকন করিলেন। সেই পুরুষ উতঙ্ককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ওহে উতঙ্ক! তুমি এই বৃষভের পুরীষ ভক্ষণ কর। উতঙ্ক ভক্ষণে সম্মত হইলেন না। তখন সেই পুরুষ পুনর্ব্বার কহিলেন উতঙ্ক! সংশয় করিতেছ কেন, ভক্ষণ কর, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্ব্বে ভক্ষণ করিয়াছেন। তখন উতঙ্ক সেই বৃষভের মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিলেন এবং ব্যস্ততাপ্রযুক্ত উত্থানান্তর আচমন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে উতঙ্ক আসনোপবিষ্ট পৌষ্য সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ ও সমুচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন আমি তোমার নিকট যাচক উপস্থিত হইলাম। রাজা অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন ভগবন্! ভৃত্য কি করিবে, আজ্ঞা করুন। উতঙ্ক কহিলেন গুরুদক্ষিণা দিবার নিমিত্ত তোমার মহিষীর কর্ণস্থ কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, তাহা তুমি আমাকে প্রদান কর। পৌষ্য কহিলেন মহাশয়! অন্তঃপুরে গিয়া গৃহিণীর নিকট প্রার্থনা করুন। উতঙ্ক তদীয় বাক্য অনুসারে

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু পৌষ্যের মহিষীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি পৌষ্যের নিকটে আসিয়া কহিলেন আমাকে প্রবঞ্চনা করা উচিত নহে, অন্তঃপুরে তোমার মহিষী নাই, তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। পৌষ্য উতঙ্কবাক্য শ্রবণানন্তর ক্ষণমাত্র অনুধ্যান করিয়া কহিলেন মহাশয়! নিঃসন্দেহ আপনি উচ্ছিষ্ট ও অশুচি আছেন, মনে করিয়া দেখুন; আমার সহধর্ম্মিণী অতি পতিব্রতা, উচ্ছিষ্ট ও অশুচি থাকিলে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তিনি কখন অশুচির দৃষ্টিগোচর হয়েন না।

রাজবাক্য শ্রবণানন্তর উতঙ্ক স্মরণ করিয়া কহিলেন আমি উত্থানানন্তর গমন করিতে করিতে আচমন করিয়াছি। পৌষ্য কহিলেন ঐ আপনকার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, উত্থানাবস্থায় অথবা গমন করিতে করিতে আচমন করা আর না করা দুই সমান। উতঙ্ক, যথার্থ কহিতেছ বলিয়া, প্রাঙ্মুখে উপবেশন ও পাণি পাদ বদন প্রক্ষালন পূর্ব্বক নিঃশব্দ, অফেণ, অনুষ্ণ, হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট জলদ্বারা বারদ্বয় আচমন ও বারদ্বয় ইন্দ্রিয় মার্জন ও পুনর্ব্বার আচমন করিয়া অন্তঃপুর প্রবেশ করিলেন, তখন রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন। পৌষ্যপত্নী দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান, অভিবাদন ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন ভগবন! আজ্ঞা করুন্ কি করিব। উতঙ্ক কহিলেন গুরুদক্ষিণার্থে কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি; তাহা দান কর। তিনি তাঁহার দ্রঢীয়সী গুরুভক্তি দর্শনে প্রসন্না ও প্রীতা হইলেন এবং ইনি অতি সৎপাত্র, ইহাঁর অভ্যর্থনা ভঙ্গ হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া কর্ণ হইতে অবমোচন পূর্ব্বক তদীয় হস্তে কুণ্ডলদ্বয় সমর্পণ করিয়া কহিলেন নাগরাজ তক্ষক এই কুণ্ডলের নিমিত্ত অত্যন্ত লোলুপ হইয়া আছেন; অতএব আপনি সাবধান হইয়া লইয়া যাইবেন। উতঙ্ক কহিলেন তোমার কোন উদ্বেগ নাই, নাগরাজ তক্ষক আমাকে পরাভব করিতে পারিবেন না।

উতঙ্ক ইহা কহিয়া সমুচিত আমন্ত্রণ পূর্ব্বক রাজপত্নীর নিকট বিদায় লইয়া পৌষ্য সকাশে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন মহারাজ! আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অনন্তর পৌষ্য উতঙ্কের নিকট নিবেদন করিলেন ভগবন্! সর্ব্বদা সৎপাত্র সংযোগ ঘটে না। আপনি অতি গুণবান্ অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব শ্রাদ্ধ করিতে চাই, ক্ষণেক অপেক্ষা করুন। উতঙ্ক

[illegible handwritten note]

কহিলেন ভাল, অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু তুমি সত্বর হইয়া, যাহা উপস্থিত আছে, তাহাই আনয়ন কর। তদনুসারে তিনি, যে অন্ন উপস্থিত ছিল, তাহাই আনিয়া তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। উতঙ্ক সেই অন্ন কেশ-সংস্পর্শদূষিত ও শীতল দেখিয়া অশুচি বোধ করিয়া কহিলেন তুমি আমাকে অশুচি অন্ন দিলে, অতএব অন্ধ হইবে। শাপ শুনিয়া পৌষ্য কহিলেন অদুষ্ট অন্ন দূষিত কহিতেছ, অতএব তুমি নির্ব্বংশ হইবে। তখন উতঙ্ক কহিলেন অশুচি অন্ন আহার করিতে দিয়া পুনর্ব্বার অভিশাপ দেওয়া উচিত নহে; তুমি বরং অন্ন প্রত্যক্ষ কর। অনন্তর পৌষ্য স্বচক্ষে সেই অন্নের অশুচিভাব প্রত্যক্ষ করিলেন।

এইরূপে সেই অন্নের অশুচিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া পৌষ্য উতঙ্ককে অনুনয় করিতে লাগিলেন ভগবন্! আমি না জানিয়া এই কেশসংস্পর্শদূষিত শীতল অন্ন আনিয়াছি, অতএব ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; এই অনুগ্রহ করুন্ যেন অন্ধ না হই। উতঙ্ক কহিলেন আমার কথা মিথ্যা হয় না; অতএব একবার অন্ধ হইয়া অতি ত্বরায় অন্ধত্বদোষ হইতে মুক্ত হইবে। আর তুমি আমাকে যে শাপ দিয়াছ, তাহা কিন্তু যেন না ফলে। পৌষ্য কহিলেন আমি শাপ সংবরণে সমর্থ নহি; এখন পর্য্যন্তও আমার কোপোপশম হয় নাই। আপনি কি ইহা জানেন না, যে ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের ন্যায় কোমল; তাঁহার বাক্য তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের ন্যায়। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের এই দুই বিপরীত; তাহার বাক্য নবনীত ও হৃদয় তীক্ষ্ণধার ক্ষুর। অতএব জাতিস্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণহৃদয়তা প্রযুক্ত আমি শাপ অন্যথা করিতে পারি না। তখন উতঙ্ক কহিলেন তুমি অন্নের অশুচিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া আমার অনুনয় করিলে। পূর্ব্বে কহিয়াছিলে নির্দ্দোষ অন্নকে দূষিত কহিতেছ অতএব নির্ব্বংশ হইবে, কিন্তু অন্ন যখন দোষ-সংযুক্ত প্রমাণ হইল, তখন আর আমাকে শাপ লাগিবেক না। এক্ষণে আমি চলিলাম। এই বলিয়া কুণ্ডল লইয়া উতঙ্ক প্রস্থান করিলেন।

উতঙ্ক পথিমধ্যে অবলোকন করিলেন এক নগ্নক্ষপণক বারংবার দৃশ্য ও বারংবার অদৃশ্য হইয়া আগমন করিতেছে। তদনন্তর সেই দুই কুণ্ডল ভূতলে রাখিয়া শৌচ আচমনাদি উদককার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই অবসরে সেই ক্ষপণক সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

উতঙ্ক উদককার্য্য সমাপন করিয়া শুচি ও সংযত হইয়া দেবগুরু প্রণাম পূর্ব্বক অতিবেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং তক্ষক অত্যন্ত সন্নিহিত হইলে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। সে, গৃহীতমাত্র ক্ষপণকরূপ পরিত্যাগ করিয়া তক্ষক স্বরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পৃথিবীতে অকস্মাৎ আবির্ভূত সম্মুখবর্ত্তী মহাগর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল এবং নাগলোকে প্রবেশ করিয়া স্বীয় আবাসে গমন করিল। উতঙ্ক পৌষ্যপত্নীর বাক্য স্মরণ করিয়া তক্ষকের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রবেশমার্গ নিরর্গল করিবার নিমিত্ত দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা সেই মহাগর্ত্ত খনন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে এইরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিয়া, যাইয়া এই ব্রাহ্মণের সাহায্য কর, স্বীয় বজ্রকে এই আদেশ দিয়া তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। বজ্র দণ্ডকাষ্ঠে আবির্ভূত হইয়া সেই গর্ত্ত বিদীর্ণ করিয়া পথ প্রস্তুত করিলে, উতঙ্ক তদ্দ্বারা নাগলোকে প্রবিষ্ট হইলেন——

উতঙ্ক এইরূপে নাগলোকে প্রবেশ করিয়া অনেকবিধ শত শত প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, বলভী নির্ষূহ এবং নানাবিধ ক্রীড়াভূমি ও আশ্চর্য্যস্থান অবলোকন করিলেন এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে নাগগণের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

উতঙ্ক কহিলেন ঐরাবত যে সকল সর্পের অধিপতি এবং যাঁহারা যুদ্ধে অতিশয় শোভমান ও বিদ্যুদ্যুক্ত পবনপ্রেরিত মেঘসমূহের ন্যায় বেগগামী, তাঁহারা ও ঐরাবতোৎপন্ন অন্যান্য সুরূপ বহুরূপ বিচিত্র কুণ্ডলালঙ্কৃত সর্পেরা সূর্য্যের ন্যায় স্বর্গলোকে বিরাজমান আছেন। গঙ্গার উত্তরতীরে নাগদিগের যে বহুসংখ্যক বাসস্থান আছে, আমি তত্রত্য মহৎ নাগদিগকে নিরন্তর স্তব করি। ঐরাবতব্যতিরিক্ত আর কে সূর্য্যরশ্মিসমূহে ভ্রমণ করিতে পারে? যখন এই ধৃতরাষ্ট্র প্রস্থান করেন তখন অষ্টাবিংশতি সহস্র অষ্ট নাগ তাঁহার অনুগামী হয়েন। যাঁহারা এই ধৃতরাষ্ট্রের অনুগামী ও যাঁহারা দূর পথ প্রস্থিত, সেই সমস্ত ঐরাবতজ্যেষ্ঠভ্রাতাদিগকে প্রণাম করি। পূর্ব্বকালে যাঁহার কুরুক্ষেত্রে ও খাণ্ডবে বাস ছিল আমি কুণ্ডলের নিমিত্ত সেই নাগরাজ তক্ষকের স্তব করি। তক্ষক ও অশ্বসেন উভয়ে সর্ব্বকালে পরস্পর সহচর হইয়া কুরুক্ষেত্রে ইক্ষুমতী নদীতীরে বাস করিয়াছিলেন, যে মহাত্মা তক্ষকপুত্র শ্রুতসেন নাগপ্রাধান্য লাভাকাঙ্ক্ষী হইয়া কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন তাঁহাকে প্রণাম করি।

ব্রহ্মর্ষি উতঙ্ক এইরূপে নাগশ্রেষ্ঠদিগের স্তব করিয়াও কুণ্ডল না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। নাগগণের স্তব করিয়াও যখন কুণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন না, তখন দেখিলেন দুই স্ত্রী উত্তম বেমাযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে, সেই তন্ত্রের সূত্রসকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহাও দেখিলেন ছয় কুমার দ্বাদশ অরবিশিষ্ট এক চক্র পরিবর্ত্তিত করিতেছে। আর এক পুরুষ ও সুন্দরাকার এক অশ্ব অবলোকন করিলেন। তখন তিনি বক্ষ্যমাণ প্রকারে তাহাদিগের সকলের স্তব করিতে লাগিলেন।

উতঙ্ক কহিলেন, এই আকল্পস্থায়ী নিত্য ভ্রমণশীল চতুর্বিংশতিপর্ব্বযুক্ত চক্রে ত্রিশত ষষ্টি তন্তুজাল অর্পিত আছে, ঐ চক্রকে ছয় কুমারে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। বিচিত্ররূপা দুই যুবতী শুক্ল কৃষ্ণ সূত্র সমূহ দ্বারা এক তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, তাঁহারাই সমস্ত ভূত ও চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপাদন করেন। যে বজ্রধারী, ভুবনপালক, বৃত্রহন্তা, নমুচিঘাতী কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রযুগল পরিধায়ী মহাত্মা লোকে সত্য ও অনৃত বিভক্ত করেন এবং যিনি এই বিশ্ব শরীর সৃজন করিয়া তাঁহাতে প্রতিবিম্বরূপে প্রবেশ করেন, সেই সকলভুবননিয়ন্তা ত্রিলোকনাথ পুরন্দরকে প্রণাম করি।

অনন্তর সেই পুরুষ উতঙ্ককে কহিলেন, আমি তোমার এই স্তবে প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার কি উপকার করিব বল। উতঙ্ক কহিলেন এই করুন, যেন সমস্ত নাগ আমার বসে আইসে। তখন সেই পুরুষ কহিলেন এই অশ্বের অপানদেশে অগ্নি প্রদান কর। তদনুসারে উতঙ্ক সেই অশ্বের অপানে অগ্নি যোজনা করিলেন। এইরূপ করাতে অশ্বের সমুদায় শরীররন্ধ্র হইতে ধূমসহিত অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দ্বারা নাগলোক উত্তাপিত হইলে, তক্ষক ব্যাকুল ও অগ্নির উত্তাপ ভয়ে বিষণ্ণ হইয়া, হস্তে কুণ্ডল লইয়া সহসা স্বীয় আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং উতঙ্ককে কহিলেন কুণ্ডল গ্রহণ কর। উতঙ্ক কুণ্ডল গ্রহণ করিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, অদ্য উপাধ্যায়ানীর ব্রতদিবস, কিন্তু আমি অনেক দূরে আসিয়াছি, কিরূপে কার্য্য সিদ্ধি হইবেক।

উতঙ্ককে এইরূপ চিন্তাবিষ্ট দেখিয়া সেই পুরুষ কহিলেন উতঙ্ক! তুমি এই অশ্বে আরোহণ কর, এ তোমাকে ক্ষণকালমধ্যেই গুরুকুলে লইয়া যাইবেক।

তদনুসারে উতঙ্ক সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া উপাধ্যায় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। উপাধ্যায়ানী স্নান করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক কেশ সংস্কার করিতে করিতে, উতঙ্ক আসিল না, বলিয়া তাঁহাকে শাপ দিবার উদ্যম করিতেছেন, এই সময়ে তিনি উপাধ্যায়গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক উপাধ্যায়ানীকে অভিবাদন করিয়া কুণ্ডল প্রদান করিলেন। উপাধ্যায়ানী কহিলেন বৎস উতঙ্ক! যথাকালে ও যথাযোগ্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, কেমন, সুখে, আসিয়াছ? আমি ভাগ্যে অকারণে তোমাকে শাপ দিই নাই। তোমার তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে, তুমি সিদ্ধি প্রাপ্ত হও।

অনন্তর উতঙ্ক উপাধ্যায়ানীর নিকট বিদায় লইয়া উপাধ্যায় সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন। উপাধ্যায় সর্ব্বাগ্রে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন বৎস উতঙ্ক! এত বিলম্ব হইল কেন? উতঙ্ক কহিলেন মহাশয়! নাগরাজ তক্ষক কুণ্ডলাহরণ বিষয়ে বিষম বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল, তন্নিমিত্ত নাগলোকে গিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, দুই স্ত্রী তন্ত্রে বসিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছে, সেই তন্ত্রের সূত্র সকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি সে কি? আর দ্বাদশ অর বিশিষ্ট এক চক্র দেখিলাম, ছয় কুমার ঐ চক্রকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে, সেই বা কি? আর এক পুরুষ ও মহাকায় এক অশ্ব দেখিলাম, তাহারাই বা কে? আর গমনকালে এক বৃষ দর্শন করিয়াছিলাম, ঐ বৃষে এক পুরুষ আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি সানুনয় বচনে কহিলেন উতঙ্ক! এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্ব্বে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পরে আমি তাঁহার কথানুসারে সেই বৃষভের পুরীষ ভক্ষণ করিলাম, তিনিই বা কে? আমি আপনার নিকট এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি।

উতঙ্কের এইরূপ জিজ্ঞাসা বাক্য শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন বৎস! যে দুই স্ত্রী দেখিয়াছ, তাঁহারা জীব ও ঈশ্বর; আর শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ সূত্র সকল রাত্রি ও দিবা; যে দ্বাদশ অরবিশিষ্ট চক্র ছয় কুমারে পরিবর্ত্তিত করিতেছেন, সে চক্র সংবৎসর, ছয় কুমারেরা ছয় ঋতু; যে পুরুষ দেখিয়াছ, তিনি ইন্দ্র; যে অশ্ব, তিনি অগ্নি। আর পথে যাইবার সময় যে বৃষ দেখিয়াছিলে, তিনি করিরাজ ঐরাবত; যে পুরুষ তদুপরি আরূঢ় ছিলেন, তিনি ইন্দ্র; আর সেই

বৃষের যে পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছ তাহা অমৃত ; উহা ভক্ষণ করিয়াছিলে তাহাতেই তুমি নাগলোকে রক্ষা পাইয়াছ। ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা, তোমার ক্লেশ দর্শনে অনুকম্পাপরবশ হইয়া তোমাকে এই অনুগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই কুণ্ডল লইয়া পুনরাগত হইয়াছ। অতএব, প্রিয় বৎস! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, গৃহে গমন কর। তুমি সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে।

উতঙ্ক উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া তক্ষকের বৈরনির্যাতন সঙ্কল্প করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে হস্তিনাপুর প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা জনমেজয়ের নিকট গমন করিলেন। রাজা পূর্ব্বে তক্ষশিলা জয়ার্থ প্রস্থান করিয়াছিলেন, তথায় সম্যক্ জয় লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। উতঙ্ক মন্ত্রিবর্গপরিবৃত সিংহাসনোপবিষ্ট রাজাকে, জয়োহস্তু, বলিয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। পরে অবসর বুঝিয়া সাধুশব্দালঙ্কৃত বাক্যে নিবেদন করিলেন মহারাজ! তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া বালকপ্রায় কর্ম্মান্তরে ব্যাসক্ত হইয়া আছ।

রাজা জনমেজয় এইরূপ ব্রাহ্মণবাক্য শ্রবণ করিয়া যথাবিধি অতিথি সৎকার সমাধান পূর্ব্বক কহিলেন মহাশয়! আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে উপেক্ষা নাই, আমি প্রজা পালনদ্বারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি। এক্ষণে আপনি কি উদ্দেশে আগমন করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন। পুণ্যশীল উতঙ্ক মহাত্মা রাজার কথা শুনিয়া কহিলেন মহারাজ! আমি যে কর্ম্মে অনুরোধ করিব, তাহা তোমারই কার্য্য। যে দুরাত্মা তক্ষক তোমার পিতার প্রাণ হিংসা করিয়াছে, তুমি তাহাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর। ঐ বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকাল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব মহারাজ! স্বীয় মহাত্মা পিতার বৈরনির্য্যাতন কর। দুরাত্মা তক্ষক বিনা অপরাধে তোমার পিতাকে দংশন করিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। সর্পকুলাধম তক্ষক বলদর্পে উদ্ধত হইয়া যে তোমার পিতাকে দংশন করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর কি অকার্য্য হইতে পারে। ধন্বন্তরি রাজর্ষিবংশরক্ষাকর্ত্তা দেবতুল্য রাজার প্রাণরক্ষার্থে আসিতেছিলেন, ঐ পাপাত্মাই তাঁহাকে নিবৃত্ত করে। অতএব মহারাজ! অবিলম্বে সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ

পাপিষ্ঠকে প্রজ্বলিত হুতাসনমুখে আহুতি প্রদান কর। ইহা করিলেই পিতার বৈরনির্য্যাতন করা হইবেক এবং আনুষঙ্গিক আমারও মহত্তর অভীষ্ট সম্পন্ন হইবেক। মহারাজ! আমি গুরুদক্ষিণা আহরণার্থে যাত্রা করিয়াছিলাম, তাহাতে ঐ দুরাত্মা যৎপরোনাস্তি বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল।

সৌতি কহিলেন, রাজা জনমেজয় শুনিয়া তক্ষকের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইলেন। যেমন, হবিঃ প্রয়োগ করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেই প্রকার, উতঙ্কবাক্যরূপ হবিঃপ্রক্ষেপ দ্বারা রাজার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন রাজা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া উতঙ্কের সমক্ষেই মন্ত্রীদিগকে পিতার স্বর্গ-প্রাপ্তি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র জনমেজয় উতঙ্কমুখে পিতার মৃত্যুবৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র দুঃখে ও শোকে অভিভূত হইলেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রাসেলাস।

তীর্থযাত্রা।

ইমলাক কহিলেন "আমি তদনন্তর সীরিয়ায় গমন করিলাম এবং তিন বৎসর প্যালেস্টিনে বাস করিলাম। তথায় ইউরোপের উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশবাসী লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হইল। তাঁহারা এক্ষণে সর্ব্বজাতিপ্রধান ও ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত লোক অপেক্ষা ক্ষমতাবান্ ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন। তাঁহাদিগের সেনাগণ দুর্জ্জেয়, তাঁহাদিগের জাহাজ অতি দূর দেশেও গতাগতি করে, তাঁহাদিগের দেশ অতি সমৃদ্ধিশালী ও ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। তাঁহাদিগের সহিত অস্মদ্দেশীয় লোকের তুলনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন, তাঁহারা মনুষ্য অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট জীব। তাঁহাদিগের দেশে কিছুই দুষ্প্রাপ্য নাই। লোকের সুখ ও সৌকর্য্যার্থে তথায় দিন দিন যে সকল শিল্পকৌশল উদ্ভাবিত হইতেছে, আমরা তাহার নামও কখন শুনি নাই। সে দেশে যাহা উৎপন্ন না হয় তাহাও বাণিজ্যের সাতিশয় শ্রীবৃদ্ধি থাকাতে দুর্লভ হয় না।"

রাজকুমার কহিলেন, "ইউরোপের লোকেরা কিসে এত পরাক্রান্ত ও ক্ষমতাবান্ হইলেন? শুনিতে পাই তাঁহারা বাণিজ্য ব্যবসায় ও জয়লাভ করিতে অনায়াসে এশিয়া ও আফ্রিকায় আইসেন। এশিয়া ও আফ্রিকার লোক কি নিমিত্ত, তাঁহাদিগের দেশ আক্রমণ করিতে পারে না, কেনই বা তদ্দেশীয় রাজগণের উপর প্রভুত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হয় না?"

ইমলাক উত্তর করিলেন, "মহাশয়! তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ ও বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়াই অধিক ক্ষমতাবান্। যেরূপ মনুষ্যজাতি বুদ্ধিমান্ বলিয়া অন্যান্য জন্তুর উপর প্রভুত্ব করে, সেইরূপ সমধিকজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা আপন অপেক্ষা অনভিজ্ঞ লোকের উপর অনায়াসে প্রভুত্ব প্রচার করিতে পারেন। আমাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের অধিক বুদ্ধি কিরূপে

হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, জগদীশ্বরের দুরবগাহ ও দুর্ভেদ্য ইচ্ছা ব্যতীত কারণান্তর দেখিতে পাওয়া যায় না।”

রাজকুমারি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, “কত দিনে আমি প্যালেস্‌টিনে যাইব, কত দিনে সেই সকল পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান্ লোকদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিব! যাবৎ সেই শুভ দিনের উদয় না হয় তাবৎ তোমার কথা ও বর্ণনা শুনিয়া কালক্ষেপ করিতে হইবেক। প্যালেস্‌টিনে এত লোক আসিয়া একত্র হয় কেন, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইতেছে; ধর্ম্মক্ষেত্র ও জ্ঞানক্ষেত্র বলিয়াই তথায় জ্ঞানী ও সাধু লোকেরা আসিয়া বাস করেন, বোধ হইতেছে।”

ইমলাক কহিলেন, “এরূপ অনেক লোক আছেন তাঁহারা তীর্থস্থান বলিয়া প্যালেস্‌টিন দেখিতে আইসেন না। ইউরোপের বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ অনেক সম্প্রদায় তীর্থযাত্রাকে পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করেন এবং উপহাসও করিয়া থাকেন।”

রাজকুমার কহিলেন, “মতভেদের কারণ আমি কিছুই অবগত নহি। তীর্থযাত্রীরা ও তীর্থযাত্রার প্রতিকূলবাদীরা আপন আপন মতরক্ষার নিমিত্ত, কি কি যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করা দীর্ঘকালসাপেক্ষ, অতএব সংক্ষেপে উভয় পক্ষের স্থূল অভিপ্রায় ব্যক্ত কর!”

ইমলাক কহিলেন, “অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্মের ন্যায়, তীর্থযাত্রাও উদ্দেশ্য বুঝিয়া কখন বা সৎকর্ম্ম, কখন বা মিথ্যা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সত্যের অনুসন্ধানের নিমিত্ত দূর দেশে ভ্রমণ করা বিহিত নয়। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে সত্যানুসন্ধান আবশ্যক, তাহা সর্ব্বত্র সম্পন্ন হইতে পারে, অনুসন্ধান করিলেন ও সর্ব্বত্র সত্যের দর্শন পাওয়া যায়। ধর্ম্মবৃদ্ধি ও চিত্ত প্রসন্ন হইবেক এই উদ্দেশে স্থান পরিবর্ত্ত করাও উচিত নয়; কারণ, স্থান পরিবর্ত্ত দ্বারা মনের চাঞ্চল্যও জন্মিতে পারে। কিন্তু যেখানে পূর্ব্বকালে গুরুতর ব্যাপার সকল সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, সর্ব্বদা তথায় গতায়াত করিলে মনে সেই সেই ঘটনা জাগ্রতী থাকে। এই নিমিত্ত যে স্থান হইতে ধর্ম্মের প্রথম উৎপত্তি হয়, লোকে তথায় গমন করে এবং তথায় যে সকল বিস্ময়াবহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, নিরন্তর তাহা স্মৃতিপথারূঢ় থাকাতে, মনে দৃঢ়তর ধর্ম্মনিষ্ঠা

হইবার সম্ভাবনা। তীর্থবিশেষে গমন করিলে জগদীশ্বর অনুকূল ও সানুগ্রহ হইবেন এই উদ্দেশে যাহারা তীর্থযাত্রা করে তাহাদিগের পর ভ্রান্ত ও মিথ্যা ধর্ম্মপরায়ণ আর নাই। যাঁহারা মনে করেন যে, প্যালেস্‌টিনে যাইলে মনের-স্বাস্থ্য ও শান্তি জন্মিবেক, মনের স্বাস্থ্য ও শান্তি জন্মিলে পাপকর্ম্মেরও অনেক নিবৃত্তি হইবেক, তাঁহারাও ভ্রান্ত বটে; কিন্তু এই উদ্দেশে যাইলে তাঁহাদিগের তাদৃশ দোষ দেওয়া যায় না। যিনি মনে করেন, তীর্থে যাইলে জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া সমুদায় পাপ মোচন করিবেন, তিনি নিতান্ত অন্ধ। এইরূপ ভাবিলে, পবিত্র ধর্ম্মের ও বিশুদ্ধ বিবেচনাশক্তির অপমান করা হয়।"

রাজকুমার কহিলেন, "ইউরোপের লোকদিগের এইরূপ মতভেদের বিষয় আমি আর এক সময় বিবেচনা করিয়া দেখিব। কিন্তু জ্ঞানের ফল তুমি কি বুঝিলে, বল। সেই সকল বিজ্ঞ লোক কি আমাদের অপেক্ষা অধিক সুখী?"

ইমলাক কহিলেন, "এই ভূমণ্ডলে মানবদিগকে সর্ব্বদা এত শোক দুঃখ সহ্য করিতে হয় যে, কোন ব্যক্তিরই, আত্মদুঃখের সহিত তুলনা করিয়া, অন্যের অপেক্ষাকৃত সুখ অনুধাবন করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু জ্ঞান যে, সুখের এক প্রধান কারণ, তাহারও সংশয় নাই। জ্ঞান সুখের কারণ না হইলে, কেহই জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা পাইত না। অজ্ঞান অভাব পদার্থ, তদ্দ্বারা কিছুই বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানাবস্থায় কোন বস্তুই চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। সে সময় অন্তঃকরণ ও আত্মা জড়ীভূত হইয়া থাকে। যখন আমরা কিছু শিখিতে পারি, আমাদিগের মনে আহ্লাদ জন্মে। যখন কিছু ভুলিয়া যাই, তখন অনুতাপ উপস্থিত হয়। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই ন্যায়ানুগত বোধ হইতেছে যে, যখন জ্ঞানোপার্জ্জনের কোন প্রতিবন্ধকতা না ঘটে, তৎকালে আমরা যত শিখিতে ও যত জানিতে পারি এবং আমাদিগের মত যত বিস্তৃত ও বহুবিষয়ী হইতে থাকে, ততই আমরা সুখী হই। যদি বিশেষ বিশেষ সুখসামগ্রী ধরিয়া সুখের গণনা করা যায়, তাহা হইলেও ইউরোপীয়দিগের অধিক সুখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে রোগ ও যে আঘাতে আমাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে অথবা সংশয়াপন্ন হইতে হয়, তাহা তাঁহারা অনায়াসে সুস্থ করিতে পারেন। শীত, বাত, আতপাদি জন্য আমাদিগকে যে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহা তাঁহারা সহজে নিবারণ করিতে

সক্ষম। আমরা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অতি কষ্টে যে কর্ম্ম সম্পাদন করি, তাহা তাঁহারা কলে কৌশলে অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। দূরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন দেশেও তাঁহাদিগের এরূপ যোগাযোগ আছে যে, আপন আপন বন্ধু বান্ধব হইতে কেহ দূরবর্ত্তী নয় বলিলেও বলা যায়। তাঁহাদিগের রাজনীতিকৌশলে জনসমাজের অনেক দুঃখ নিবারণ হইয়া থাকে। তাঁহারা পর্ব্বতের মধ্য দিয়াও পথ প্রস্তুত করিতে পারেন, নদীর উপর দিয়াও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সকল গৃহে বাস করেন, তাহাও স্বাস্থ্যকর, সুদৃশ্য ও বহুকালস্থায়ী। তাঁহাদিগের বিষয়াদিও নিরাপদে রক্ষিত হইয়া থাকে।"

"যাঁহাদিগের এত সুখ ও সৌকর্য্যসাধন সামগ্রী আছে, তাঁহারা সুখী হইলেও হইতে পারেন। দূরবর্ত্তী বান্ধবেরাও পরস্পর মনের কথা ব্যক্ত করিতে ও আপন আপন সংবাদ পাঠাইতে পারেন শুনিয়া, আমার যত ঈর্ষ্যা হইতেছে তত ঈর্ষ্যা আর কিছুতেই হয় নাই।" রাজকুমারের এই কথা শুনিয়া ইমলাক কহিলেন "হাঁ তাঁহারা আমাদিগের মত এত অসুখী নন বটে, কিন্তু তাঁহারাও প্রকৃত সুখী নন। মনুষ্যজন্ম লাভ করিলেই অধিক দুঃখ, সুখভোগ অতি অল্পমাত্র।"

রাজকুমার কহিলেন, "জগদীশ্বর মনুষ্যলোকে সুখবিতরণে এত কৃপণতা করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যদি আমি ইচ্ছানুরূপ চলিতে পারি, তাহা হইলে সুখীও হইতে পারি। তখন আমি কাহারও অপকার করি না, কাহারও রোষানল প্রদীপ্ত করিয়া দিই না, সকলের দুঃখ মোচন করি, সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ করি, সুতরাং সকলেই আমার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। বিজ্ঞ লোকের সহিত মিত্রতা করি, গুণবতী ভার্য্যা পরিগ্রহ করি, সুতরাং বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের ভয় থাকে না। সমুচিত যত্ন করিয়া পুত্রদিগের সুশিক্ষা দি, তাহারাও সুশিক্ষিত হইয়া বিনীত, সুশীল ও ধার্ম্মিক হয়, এবং বাল্যকালে আমার নিকট হইতে যে উপকার লাভ করে, আমার বার্দ্ধক্যে প্রত্যুপকার করিয়া তাহার পরিশোধ দেয়। যাহাদিগকে আমি আশ্রয় দি, যাহাদিগকে আমি ঐশ্বর্য্যশালী করি, তাহারা আমার চতুর্দ্দিকে থাকিতে কে আমাকে দুঃখ দিতে

পারে? তখন এক পক্ষে আশ্রয়দান, আর এক পক্ষে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ দ্বারা সুখে ও নিরুদ্বেগে জীবন যাপিত হইতে থাকে। ইউরোপের কল কৌশলের সাহায্য ব্যতিরেকেও ত এ সকল সম্পন্ন হইতে পারে। তবে ঐ সকল কল কৌশল তাদৃশ সুখসাধন বলিয়া বোধ হয় না। ভাল, সে কথা এখন থাকুক, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।"

ইমলাক কহিলেন, "প্যালেসটিন হইতে বহির্গত হইয়া এশিয়ার অন্যান্য রাজ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সমধিকসভ্যতাসম্পন্ন রাজ্যে বণিকের বেশে এবং অসভ্য দেশে তীর্থযাত্রীর বেশে পর্যটন করিতে লাগিলাম। পরিশেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা জন্মিল। যে স্থানে বাল্যকাল বাল্যক্রীড়ায় অতিবাহিত হইয়াছিল, যে স্থানে যৌবনকালে অনেকের সহিত বন্ধুতা জন্মিয়াছিল, অনেক পর্যটন ও অনেক পরিশ্রমের পর, তথায় গিয়া বিশ্রাম করিতে অভিলাষ হইল এবং আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন দ্বারা বান্ধবদিগের কৌতুকোৎপাদন করিতে ইচ্ছা জন্মিল। যাঁহাদিগের সহিত সর্বদা ক্রীড়া কৌতুক করিতাম, যাঁহাদিগের সহিত একত্র বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলাম, তাঁহারা একে একে আমার সমুৎসুক চিত্তে পদ প্রাপ্ত হইলেন, মনে মনে তাঁহাদিগের বিষয়ই সর্বদা ধ্যান করিতে লাগিলাম। মনে হইল যেন, তাঁহারা সায়ংকালে আমার চতুর্দিকে আসিয়া বসিয়াছেন, আমার উপাখ্যান শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত ও বিস্ময়াপন্ন হইতেছেন এবং মনোযোগপূর্বক আমার উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন।"

"মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা প্রবল হওয়াতে স্বদেশগমনোপযোগী কার্য্য ব্যতিরেকে অন্য কার্য্যে যে সময় যাপিত হইতে লাগিল, তাহা যেন বৃথা নষ্ট করিলাম বলিয়া বোধ হইতে আরম্ভ হইল। অনন্তর সত্বর হইয়া ঈজিপ্ট দেশে যাত্রা করিলাম। স্বদেশদর্শনে সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছিলাম, তথাপি পূর্বকালে তথায় যে সকল বিদ্যা প্রচলিত ছিল এবং শিল্পকৌশলে যে সকল বিস্ময়াবহ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার বিনাশাবশেষ অনুসন্ধান করিতে করিতে দশ মাস অতীত হইল। ঈজিপ্টের রাজধানী কায়রো নগরে পৃথিবীর সমুদায় জাতি আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে দেখিলাম। কেহ বা জ্ঞানানুশীলনের নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন, কেহ বা ধনোপার্জ্জনের প্রত্যাশায়

আসিয়াছেন। ইচ্ছামত সকল কর্ম্ম করিতে পারিব, কেহ সন্ধান লইবে না, বলিয়াও অনেকে আসিয়া বাস করিতেছে। তাদৃশ জনাকীর্ণ নগরে জনসমাজে বাস জন্য যে সুখলাভসম্ভাবনা, তাহাও সম্পন্ন হয় এবং নির্জ্জনে বাস করিলে যে সকল বিষয় গোপনে থাকে, তাহাও গুপ্ত থাকিতে পারে।”

“কায়রো হইতে সুইয়েজে প্রস্থান করিলাম এবং লোহিত সাগরে জাহাজে আরোহণ করিয়া, যে বন্দর হইতে বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে প্রথম জাহাজ ছাড়িয়াছিলাম, তথায় গিয়া পঁহুছিলাম। অনন্তর পান্থদিগের সহিত মিলিত হইয়া, কতিপয়দিবসে দেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যাইতে যাইতে মনে মনে মনোরথ করিতে লাগিলাম যে, বাটীতে পঁহুছিলে জ্ঞাতি কুটুম্ব ও আত্মীয়বর্গ আসিয়া সমাদরে আলিঙ্গন করিবেন, বন্ধু বান্ধবেরা আহ্লাদিতচিত্তে অভিনন্দন ও সাদর সম্ভাষণ করিবেন, পিতার ধনলালসা যত প্রবল হউক না কেন, যে পুত্র, বংশ উজ্জ্বল এবং দেশের মান সম্ভ্রম ও সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম, এমন পুত্রকে দেখিয়া অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু শীঘ্রই জানিতে পারিলাম যে, আমি যত মনোরথ করিয়াছিলাম সকলই অলীক। দেশে গিয়া শুনিলাম, চতুর্দ্দশ বৎসর হইল, পিতা আমার সহোদরদিগকে আপন ধন সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন; ভ্রাতারাও তথায় নাই, দেশ দেশান্তরে গিয়া বাস করিতেছেন। আমার সঙ্গিগণ অনেকেই পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; যাঁহারাও বা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহবা অতি কষ্টে চিনিতে পারিলেন; কেহবা বিদেশীয় আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হওয়াতে, আমাকে ভ্রষ্টাচার বিবেচনা করিয়া অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।”

“যে ব্যক্তি নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াছে, অনেক দেখিয়াছে ও অনেক শুনিয়াছে, সে নিতান্ত দুঃখে পড়িলেও সহসা ভগ্নোৎসাহ বা একবারে বিষাদসাগরে মগ্ন হয় না। সমুদায় আশা বিফল হইল বলিয়া যে শোক তাপ উপস্থিত হইল তাহা কিয়দ্দিনের মধ্যেই বিস্মৃত হইলাম। তখন তত্রস্থ প্রধান প্রধান লোকদিগের নিকট পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাঁহারা আমাকে নিকটে যাইতে দিলেন, আমার উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিদায় করিলেন। তদনন্তর আমি এক বিদ্যালয়

স্থাপন করিয়া শিক্ষা দিবার মানস করিলাম; কিন্তু সকলেই প্রতিবন্ধকতাচরণ করিল, বিদ্যালয় স্থাপন করিতে দিল না। তখন গৃহস্থ হইয়া সংসার ধর্ম্ম করিবার মানসে এক কামিনার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলাম, তিনি আমার কথা বার্ত্তা শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন ও শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হইতেন। কিন্তু আমার পিতা বণিক্ এই কথা শুনিয়া, বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন।"

"এইরূপ অনুগ্রহাভিলাষ ও নিগ্রহভোগে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া, পৃথিবী হইতে আত্মগোপন করিবার অভিলাষ করিলাম, লোকের ইচ্ছামাত্রের উপর নির্ভর করিতে আর বাসনা হইল না। সুখময় গিরিগর্ভের দ্বারমোচনের অপেক্ষায় রহিলাম। একবারে সমুদায় আশায় জলাঞ্জলি দিতে ইচ্ছা জন্মিল। দ্বার খুলিবার নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে, আমার বিদ্যা বুদ্ধি গিরিগর্ভে বাস করিবার উপযোগিনী বোধ হওয়াতে, আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল; আমিও সানন্দচিত্তে পৃথিবীর নিকট বিদায় লইয়া, চির-কারায় আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিলাম।"

রাসেলাস কহিলেন "তুমি কি এখানে আসিয়া সুখী হইয়াছ? সত্য করিয়া বল, তুমি কি এই অবস্থায় সন্তুষ্ট আছ? তোমার কি পুনর্ব্বার পৃথিবীতে যাইয়া ভ্রমণ করিতে ও নানা বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে ইচ্ছা হয় না? গিরিগর্ভবাসী সকলেই আপন আপন ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন ও আপন আপন সুখের অংশভাগী করিবার নিমিত্ত বৎসরে নূতন নূতন লোকদিগকে আহ্বান করেন। তুমিও কি গিরিগর্ভে আসিয়া তাঁহাদের ন্যায় আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিয়া থাক?"

ইমলাক কহিলেন, "রাজকুমার! আমি সত্য কহিতেছি, এই গিরিগর্ভে যত লোক বাস করে, সকলেই সেই সেই দিন দুর্দ্দিন বলিয়া গণনা করে, যে দিনে তাহারা এই কারায় আবদ্ধ হইয়াছে। আমি তাহাদিগের মত তত অসুখী বা অসন্তুষ্ট নই। কারণ, আমি অনেক দেখিয়াছি, অনেক শুনিয়াছি, আমার মনে কত ভাব সঞ্চিত আছে। ইচ্ছামত তাহাই স্মরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকি। যে সকল জ্ঞান আমার স্মৃতিশক্তি হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার স্মৃতিপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা করাতে, এই

নির্জ্জন প্রদেশেও সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকি ও সুস্থির চিত্তে কালযাপন করি। আমি অতীত বৃত্তান্ত ও অতীত ঘটনা স্মরণ করিয়া, মনে মনে আহ্লাদিত হই। কেবল এই বলিয়া দুঃখ ও অনুতাপ হয় যে, আমি যাহা শিখিয়াছি ও যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা আর কাজে লাগিবে না এবং যে সকল সুখ সম্ভোগ করিয়াছি তাহাও আর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। অত্রস্থ অন্যান্য লোকের উপস্থিত বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান নাই; বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত না থাকাতে, ইহাদিগের অন্তঃকরণ জড়ীভূত ও ঈর্ষ্যা, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আস্পদ হইতেছে।”

রাজকুমার কহিলেন “যাহাদিগের প্রতিপক্ষ নাই, তাহারা কেন ঈর্ষ্যা হিংসাদির বশীভূত হইবেক? আমরা যে স্থানে আছি, এখানে কাহারও প্রভুত্ব নাই, কাহারও প্রতি কোন ব্যক্তির হিংসাও জন্মিতে পারে না; এখানে সকলেই সমান সুখ সম্ভোগ করে। তবে ঈর্ষ্যা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা কি?”

ইমলাক উত্তর করিলেন “ইহা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে যে, এক ব্যক্তি অপেক্ষা আর এক ব্যক্তি অধিক সন্তুষ্ট করিতে পারে। যে অধিক সন্তুষ্ট করিতে পারে সে অধিক আদরণীয় হয়; যে তাদৃশ সন্তুষ্ট করিতে না পারে সে আপনাকে অনাদরণীয় দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ হয়। বিশেষতঃ যাহারা তাহাকে অনাদর করে, তাহাদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিতে হইলে তাহার ঈর্ষ্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে। গিরিগহ্বরবাসী লোকেরা যে অন্যকে এখানে আসিতে আহ্বান করে, তাহাও তাহাদিগের মাৎসর্য্যের কার্য্য বলিলেও বলা যায়। তাহারা আপনারা নিরন্তর দুঃখ ভোগ করে, কারাবদ্ধ থাকিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইতে থাকে এবং মনে করে, নূতন লোকের সঙ্গ পাইলে সুখী হইব। এই প্রত্যাশায় নূতন লোকদিগকে এখানে আনয়ন করে। তাহারা আত্ম-দোষে আপন স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়াছে এবং অন্যের সেই স্বাধীনতা দেখিতে না পারিয়া তাহাদিগকে কারাবদ্ধ করিবার চেষ্টা পায়। যাহা হউক, আমি এই দোষে লিপ্ত নই। কেহই এমন কথা বলিতে পারিবেন না যে, আমি অন্যকে দুরবস্থাগ্রস্ত করিতেছি। যাহারা প্রতিবৎসর কারাবদ্ধ হই-বার প্রার্থনা করে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত অনুতাপ করিয়া থাকি; তাহা-

দিগকে পূর্ব্বে সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইহাও মনে মনে বিবেচনা করি।”

রাজকুমার কহিলেন, “ইমলাক! ভাই, এখন তোমার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলি। আমি বহুদিবসাবধি এই গিরিগর্ভ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছি, আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোন দিকেই পলাইবার পথ দেখিতে পাই নাই। কিরূপে আমি এই পর্ব্বতের বহির্গত হইতে পারি, তাহার উপায় বলিয়া দাও। পলাইবার সময়, তুমি আমার সঙ্গী হইবে, দেশভ্রমণের সময় পথদর্শক হইবে, আমার ধনের অংশী হইবে এবং কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত তদ্বিষয়ে উপদেশক হইবে।”

ইমলাক কহিলেন, “মহাশয়! আপনার পলায়ন করা কঠিন কর্ম্ম দেখিতেছি। যদিও কথঞ্চিৎ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলেও বোধ হয়, শীঘ্র আপনাকে তজ্জন্য অনুতাপ করিতে হইবেক। আপনি পৃথিবীকে গিরিগর্ভগত ঐ হ্রদের ন্যায়, নিস্তব্ধ ও নিরুপদ্রব বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ নয়। আপনি তথায় গিয়া দেখিবেন, তরঙ্গাকুল সমুদ্রের ন্যায়, পৃথিবী অতি ভয়ঙ্কর স্থান। তথায় আপনাকে শত শত বার উপদ্রব-তরঙ্গে অভিভূত হইতে হইবেক এবং বিশ্বাসঘাতকতারূপপাষাণে পতিত হইয়া সংশয়াপন্ন ও বিষমদুরবস্থাগ্রস্ত হইতে হইবেক। আপনি তথায় গিয়া এমন চাতুরী ও প্রতারণাজালে নিপতিত হইবেন এবং আপনাকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইবেক যে, তখন এই নিরুপদ্রব গিরিগর্ভ শত শত বার স্মরণ করিবেন, ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে মনে কত অনুতাপ উপস্থিত হইবেক এবং আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া পুনর্ব্বার এই গিরিগর্ভে আসিয়া নির্ভয়ে ও নিরুদ্বেগে কালক্ষেপ করিবার ইচ্ছা হইবেক।”

রাজকুমার কহিলেন, “আমার মনে যে অভিলাষ হইয়াছে, তাহা হইতে আমাকে নিরাশ করিবার চেষ্টা করিও না। তুমি যাহা যাহা দেখিয়াছ, সে সমুদায় আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অধীর হইয়াছি। গিরিগর্ভে বাস করা যখন তোমারও ভাল লাগিতেছে না, তখন ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, তোমার পূর্ব্বের অবস্থা এই অবস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। পৃথি-

বীতে যাইবার ফল যাহা হউক না কেন, আমি একবার স্বচক্ষে পৃথিবী না দেখিয়া ক্ষান্ত হইব না। আমি স্বচক্ষে পৃথিবীস্থ লোকের অবস্থা দেখিয়া আপনিই ভাল মন্দ বিবেচনা করিব এবং কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত, দেখিয়া শুনিয়া, তাহাও স্থির করিয়া লইব।"

ইমলাক কহিলেন, "আপনার পলাইবার দৃঢ়তর প্রতিবন্ধক দেখিতেছি। কিন্তু যদি পৃথিবীতে যাইবার নিতান্ত আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে আমি সে আগ্রহ পরিত্যাগ করিতেও পরামর্শ দিই না। যে বিষয়ে আগ্রহ হয়, সে বিষয় অবশ্যই সম্পন্ন হইতে পারে। পরিশ্রম ও ধীশক্তির কিছুই অসাধ্য নাই।"

পলায়নের উপায়-উদ্ভাবন।

তদনন্তর রাজকুমার আপন প্রিয়পাত্র ইমলাককে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার মুখে যে সকল আশ্চর্য্য ও অশ্রুতপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন মনে মনে তাহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। শত শত সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল, প্রাতঃকালে ইমলাককে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন স্থির করিয়া রাখিলেন।

এইরূপে রাজকুমারের অনেক অসুখ নিবারণ হইল। তিনি এমন একজন বন্ধু পাইলেন যাহাকে মনের কথা বলিতে পারিবেন এবং যাহার অভিজ্ঞতা তাঁহার মনোরথসম্পাদনের সাধন হইলেও হইতে পারিবেক। তদবধি তিনি নির্জ্জনে বসিয়া আর বিলাপ করিতেন না। তিনি ভাবিতেন যে, আমি এমন একজন সঙ্গী পাইয়াছি, যাহার সহিত একত্র বাস করিলে এই গিরিগর্ভও নিতান্ত দুঃসহ বোধ হইবে না এবং যদি ইহার সহিত পৃথিবীতে যাইতে পারি, তাহা হইলে আর কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকিবে না।

কিছুদিনের মধ্যে গিরিগর্ভ হইতে বর্ষার জল নির্গত হইল এবং সমুদায় ভূমি শুষ্ক হইয়া গেল। রাজকুমার ও ইমলাক প্রাসাদের বহির্গত হইয়া পরিশুষ্ক ভূমিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে, যে সকল কথাবার্ত্তা কহিতেন, কেহ জানিতে পারিত না। গিরিগর্ভ অতিক্রম করিয়া পলাইবার ইচ্ছা রাজকুমারের মনে সর্ব্বদাই জাগ্রতী ছিল; একদা দ্বারের নিকট

দিয়া গমন করিবার সময়, দ্বারকে সম্বোধন করিয়া বিষণ্ণচিত্তে কহিলেন, "দ্বার! কেন তুমি এরূপ দৃঢ় হইয়াছিলে এবং মানবেরাই বা কেন এত ক্ষীণবল হইয়াছে?"

ইমলাক কহিলেন, "মনুষ্যেরা ক্ষীণবল নয়, তাহাদিগের যে এক বুদ্ধি-বল আছে তাহাতেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। শারীরিক বল অপেক্ষা বুদ্ধি-বল দ্বারা অনেক কার্য্য সমাধা হয়। বুদ্ধিমান্ শিল্পকরেরা শারীরিক শক্তিকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। আমি এই লৌহদ্বার এখনই ভগ্ন করিতে পারি, কিন্তু গোপনে পারি না। সুতরাং গিরির বহির্গত হইতে হইলে উপায়ান্তর অবলম্বন করা বিধেয়।"

অনন্তর তাঁহারা পর্ব্বতের নিকটে গেলেন ও দেখিলেন বর্ষার জলে আবাসগর্ত্ত পূর্ণ হওয়াতে, কতকগুলি শশক আপন আপন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে গিয়াছিল, এক্ষণে জল শুষ্ক হওয়াতে নিম্ন হইতে উপরের দিকে বক্রভাবে পুনর্ব্বার আবাসগর্ত্ত প্রস্তুত করিতেছে। ইমলাক কহিলেন, "প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, মানবেরা পশুদিগের কৌশল দেখিয়া অনেক শিল্পকর্ম্ম শিখিতে পারেন। যদি শশকের কৌশল দেখিয়া আমরা কিছু শিখিতে পারি, তাহাতে ঘৃণা বা অবহেলা করা উচিত নয়।" অনন্তর নিকটবর্ত্তী হইয়া শশকদিগের গর্ত্তনির্ম্মাণের কৌশল দেখিয়া ইমলাক কহিলেন, "আমরাও এইরূপ গর্ত্ত খনন করিলে পর্ব্বত ভেদ করিতে পারিব। যেখানে পর্ব্বতের শৃঙ্গ নিম্ন হইয়া রহিয়াছে, ঐ স্থানে খনন করিতে আরম্ভ করা যাইবেক এবং যাবৎ শেষ না হয় তাবৎ পরিশ্রম করিতে হইবেক।"

রাজকুমার যখন এই কথা শুনিলেন, তাঁহার নয়নযুগল আনন্দে বিকসিত হইল। তিনি ভাবিলেন, ইহা সম্পন্ন করা সহজ, সম্পন্ন হইলেও অবশ্য মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারিবেক। তদনন্তর আর বৃথা সময় নষ্ট করিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া উভয়েই খননের স্থান নিরূপণ করিতে গেলেন। অতি কষ্টে পর্ব্বতে উঠিলেন, ভগ্ন প্রস্তরের উপর ভ্রমণ করাতে ও কণ্টকবনে বারবার যাতায়াত করাতে, সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু সুবিধামত স্থান দেখিতে পাইলেন না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসও এইরূপ স্থান নিরূপণ করিতে করিতে অতিবাহিত হইল। চতুর্থ দিবসে জঙ্গলে এক

ক্ষুদ্র গর্ত্ত দেখিতে পাইলেন এবং তথায় খনন করিয়া দেখিতে অভিলাষ করিলেন।

ইমলাক প্রস্তর খনন করিবার অস্ত্র ও মৃত্তিকা ফেলিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ব্যগ্র হইয়া দুই জনই কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কর্ম্ম আরম্ভ না করিতেই রাজকুমার পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং ঘাসের উপর বসিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। রাজকুমারকে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ দেখিয়া ইমলাক কহিলেন, "মহাশয়! অভ্যাস হইলে আমরা ক্রমে অধিক শ্রম করিতে পারিব। গুরুতর কর্ম্ম সকল বল দ্বারা একবারে সম্পাদিত হয় না, অধ্যবসায় ও কাল সহকারে ক্রমে ক্রমে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। একখানি প্রস্তরের উপর আর একখানি প্রস্তর বসাইয়া ঐ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, দেখুন, উহা কত উচ্চ ও কত বড় বিস্তৃত। দিনের মধ্যে তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া পর্য্যটন করিলে, সাত বৎসরে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া আসা যায়।"

তাঁহারা প্রতিদিন আসিয়া খনন করিতে লাগিলেন। খনন করিতে করিতে প্রস্তরের মধ্যে এক ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। যে পর্য্যন্ত ছিদ্র ছিল্ল তাহাতে অক্লেশে ও অনায়াসেই পথ প্রস্তুত হইল। রাসেলাস তাহাকেই শুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ইমলাক কহিলেন, "যে চিন্তা ন্যায়ানুগত নহে তাহাকে মনোমধ্যে স্থান দেওয়া উচিত নয়। যদি আপনি শুভ লক্ষণ দেখিয়া আহ্লাদিত হন তবে দুর্নিমিত্তদর্শনে অবশ্যই শঙ্কাতুর হইবেন। তাহা হইলেই আপনার অন্তঃকরণ কুসংস্কারে আবদ্ধ হইবেক। যাহারা অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে কর্ম্ম করিতে থাকে, তাহাদিগের সৌকর্য্যসাধন ও সন্তোষকর এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। যাহা কঠিন কর্ম্ম বলিয়া মনে বিবেচনা হয়, সম্পাদনের সময় তাহাও সহজ হইয়া উঠে।"

সহসা নিকায়ার আগমন।

তাঁহারা গর্ত্তের অভ্যন্তরে খনন করিতেছিলেন এবং পলাইতে পারিলে সমুদায় শ্রম সার্থক হইবে এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে, রাজকুমার বায়ুসেবনের নিমিত্ত গর্ত্তের বহির্গত হইলেন। বহির্গত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার ভগিনী নিকায়া গর্ত্তের সম্মুখে দণ্ডায়মান। তখন স্তব্ধ ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া মনের কথা ব্যক্ত করিতেও ভয় পাইলেন, গোপন করিবারও কোন উপায় দেখিলেন না। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, ভগিনীর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করাই উচিত, ভগিনীর সাক্ষাতে মনের কথা সমুদায় ব্যক্ত করিয়া, অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে বারণ করিয়া দেওয়াই সৎপরামর্শ।

রাজকুমারী কহিলেন "ভ্রাতঃ! এমন বিবেচনা করিও না যে, আমি গূঢ়চর স্বরূপ হইয়া এখানে আসিয়াছি। আমি প্রত্যহ গবাক্ষদ্বার দিয়া দেখিতাম যে, তুমি ইমলাকের সহিত প্রতিদিন এইদিকে আসিয়া থাক। সুশীতলসমীরণসেবন, স্নিগ্ধ বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন ও সুগন্ধময় তীরে পরিভ্রমণ ব্যতিরিক্ত তোমরা অন্য কোন কর্ম্ম করিতে আইস এমন বিবেচনা হয় নাই। তোমাদিগের কথোপকথন শুনিব বলিয়া আমিও আজ এইদিকে আসিয়াছি। যাহা হউক, তোমরা যাহা করিতেছ দেখিলাম। এক্ষণে আমাকেও ইহার ফলভাগী করিতে হইবেক। তোমরা কারাবদ্ধ থাকিয়া যেরূপ ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়াছ; আমিও ততোধিক বিরক্ত হইয়া পৃথিবীর অবস্থা দেখিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছি। অতএব আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবেক। এই গিরিগর্ভের আমোদ প্রমোদ আমার আর ভাল লাগে না। বিশেষতঃ তোমরা এখান হইতে যাইলে কোন প্রকারে এখানে আর থাকিতে পারিব না। তোমরা সঙ্গে লইয়া যাইতে অস্বীকার করিলেও করিতে পার, কিন্তু অনুগমনে বাধা দিতে পারিবে না।"

রাজকুমার অন্যান্য ভগিনী অপেক্ষা নিকায়াকে অধিক ভাল বাসিতেন; সুতরাং তাঁহার প্রার্থনায় অস্বীকার করিতে পারিলেন না। ভগিনীর নিকট অগ্রেই মনের কথা আপনা হইতে ব্যক্ত করেন নাই বলিয়া, অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ইহা স্থির হইল যে, নিকায়াও তাঁহাদিগের সহিত

যাইবেন। পাছে আর কেহ কৌতুকাক্রান্ত হইয়া অথবা সহসা তথায় আসিয়া সমুদায় ব্যাপার দেখিয়া যায়, এইজন্য রাজকুমার, ভগিনীকে সাবধান হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে অনুমতি দিয়া, গর্ত্তের অভ্যন্তরে গিয়া পুনর্ব্বার কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে তাঁহাদিগের পরিশ্রম সমাপ্ত হইল। সুড়ঙ্গ দিয়া পর্ব্বতের বহির্ভাগস্থিত সূর্য্যের আলোক দেখা গেল। তাঁহারাও সুড়ঙ্গ দিয়া পর্ব্বতের বহির্ভাগে গিয়া দেখিলেন, নিম্নে নীল নদের মূল প্রবাহ মন্দ মন্দ বহিতেছে। রাজকুমার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া আনন্দে প্রফুল্ল হইলেন এবং ভ্রমণের সময় কত আনন্দ অনুভূত হইবে, কত আশ্চর্য্য বস্তু দেখিতে পাইব, ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পিতার রাজ্যের বহির্গত হইয়াছি বলিয়াই তাঁহার মনে বোধ হইল। কারা হইতে মুক্ত হইলাম বলিয়া ইমলাক আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সুখ অনুভব করিয়া একান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তথায় আর অধিক সুখসম্ভোগের প্রত্যাশা করিলেন না।

রাসেলাস যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, দেখেন কোন দিকেরই সীমা নাই, চতুর্দ্দিকেই অপরিসীম আকাশমণ্ডল। অপরিচ্ছিন্ন আকাশমণ্ডল দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। নিমেষশূন্য নয়নে দশ দিক দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাকে গিরিমধ্যে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আনাও কঠিন কর্ম্ম হইল। অনেক ক্ষণের পর প্রত্যাগত হইয়া, প্রফুল্লনয়নে ভগিনীকে কহিলেন যে, পথ প্রস্তুত হইয়াছে, এক্ষণে প্রস্থান করিলেই হয়।

রাজকুমার ও রাজকুমারীর প্রস্থান ও নানা আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন।

রাজকুমার ও রাজকুমারীর মণি, মুক্তা, হীরা প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যজাত ছিল ; ইমলাকের উপদেশানুসারে বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া লইলেন। এবং পর দিন পূর্ণিমার রাত্রিতে সকলে গিরিগর্ভ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। রাজকুমারীর পরমপ্রীতিপাত্র এক সখীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তু সে কোথায় যাইতেছে তাহা জানিতে পারিল না। সুড়ঙ্গ দিয়া প্রবেশ করিয়া সকলে বহির্গত হইলেন ; বহির্ভাগে আসিয়া নিম্নে নামিতে আরম্ভ

করিলেন। রাজকুমারী ও তাঁহার সখী চতুর্দ্দিকে চক্ষু নিক্ষেপ করিয়া, কোন দিকেরই সীমা দেখিতে না পাইয়া, সাতিশয় ভীত হইলেন এবং আপনাদিগকে বিপন্ন জ্ঞান করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ও ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে কহিলেন, "যে পর্য্যটন সমাপ্ত হইবে না বোধ হইতেছে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে আমাদিগের ভয় জন্মিতেছে। এই অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন পথে পদার্পণ করিতে আমাদিগের সাহস হয় না। এখানে কত অপরিচিত লোক আমাদিগের নিকটে আসিবে। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নেও যাহাদিগকে দেখি নাই, এমন কত শত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।" রাজকুমারের মনেও এইরূপ ভয়ের উদয় হইতেছিল, কিন্তু বলিলে কাপুরুষতা প্রকাশ হয় এই নিমিত্ত গোপন করিয়া রাখিলেন।

ইমলাক ভয়ের কথা শুনিয়া হাস্য করিলেন এবং গমন করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। রাজকুমারী, যাইবেন কি না, ইহা স্থির করিতে করিতে এত দূরে গিয়া পড়িলেন যে, তথা হইতে ফিরিয়া আসা কঠিন কর্ম্ম বোধ হইল; সুতরাং ফিরিয়া আসা হইল না। প্রাতঃকালে দেখিলেন, রাখালেরা মাঠে গোমেষাদির পাল চরাইতেছে। তাহারা দুগ্ধ ও ফল মূল আনিয়া দিল। রাজকুমারী সুসজ্জিত প্রাসাদ ও সুখাদ্যসামগ্রীপরিপূর্ণ বহুমূল্য ভোজনপাত্র না দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিন্তু পথশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া দুগ্ধ পান ও ফল মূল আহার করিলেন; দেখিলেন, গিরিগর্ভের খাদ্য দ্রব্য অপেক্ষা উহা সুস্বাদ ও সুমধুর।

পথ চলা অভ্যাস ছিল না, তথাপি ধরিবার ভয়ে বসিয়া না থাকিয়া আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের পর এক জনাকীর্ণ রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গিগণ তত্রস্থ লোকদিগের রীতি, চরিত্র, আচার, ব্যবহার ও অবস্থার বিভিন্নতা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করাতে, ইমলাক মনে মনে হাসিতে লাগিলেন।

পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাদিগকে রাজপরিবার বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি রাজকুমার যেখানে যাইতেন, প্রত্যাশা করিতেন যে, লোকে তাঁহাদিগের সমাদর করিবে। রাজকুমারীর নিকট যে সকল লোক আসিত, তাহারা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিত না বলিয়া তিনি বিরক্ত হইতেন।

পাছে তাঁহারা আপন আপন পদমর্য্যাদা প্রকাশ করেন এই শঙ্কায়, ইমলাককে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া তাঁহাদিগকে দৃষ্টিপথে রাখিতে হইত। প্রথমে যে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তত্রস্থ জনগণের আচার ব্যবহার দেখিয়া সাধারণ লোকের আচার ব্যবহার পরিজ্ঞান হইবেক ও সামান্য লোকের সঙ্গে থাকা অভ্যাস হইয়া যাইবেক বলিয়া, ইমলাক তাঁহাদিগকে অনেক দিন তথায় রাখিলেন। রাজকুমার ও রাজকুমারী ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা কিছু দিনের নিমিত্ত আপন আপন পদমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে লোকের দয়া ও সৌজন্যের উপর নির্ভর করিয়া যাহা লাভ করা যায় তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছু প্রত্যাশা করা উচিত নয়। জনাকীর্ণ নগরে যাইলে বাণিজ্যবিপণির গোলযোগ ও বণিক্‌দিগের রূঢ় আচরণ সহ্য করিতে হইবে বলিয়া, ইমলাক ক্রমাগত উপদেশ দিয়া, পরিশেষে তাঁহাদিগকে সমুদ্রের উপকূলে লইয়া গেলেন। সমুদ্রের উপকূলে এক বন্দর ছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজকুমার ও রাজকুমারীর পক্ষে সকল বস্তুই নূতন, তাঁহারা যেখানে যান, নূতন নূতন বস্তু দেখিতে পান; সুতরাং অধিক দূর না গিয়া সমুদ্রের উপকূলস্থিত সেই বন্দরেই কিছু দিন থাকিলেন। তাঁহারা থাকিলেন বলিয়া ইমলাক সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ তাঁহারা লোকের রীতি চরিত্র তখনও পর্য্যন্ত সুন্দররূপ জানিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে একবারে দূর দেশে লইয়া যাওয়া উচিত নয়। কিছু দিনের পর ইমলাক ভাবিলেন যে, এখানে অধিক দিন থাকিলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা, এখানে আর অধিক দিন থাকা বিধেয় নয়; এই বিবেচনা করিয়া যাত্রার দিন স্থির করিলেন। রাজকুমার কিছু জানিতেন না বলিয়া কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ইমলাক যাহা বলিতেন ও যে পরামর্শ দিতেন তাহাতেই সম্মত হইতেন। এক খান জাহাজ সুইয়েজে যাইতেছিল, ইমলাক তাহারই এক গৃহ ভাড়া লইলেন। জাহাজ ছাড়িবার সময় রাজকুমারীকে অতি কষ্টে জাহাজে প্রবেশ করাইতে হইল। জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে শীঘ্র সুইয়েজে গিয়া পঁহুছিল। তথা হইতে স্থলপথে তাঁহারা কায়রো গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রীতারাশঙ্কর তর্করত্ন।

চঞ্চল জগৎ

সচরাচর মনুষ্যের বোধ এই যে, গতি জগতের বিশেষ অবস্থা; স্থিরতা জগতের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, গতিই স্বাভাবিক অবস্থা; স্থিরতা কেবল গতির রোধ মাত্র। যাহা গতি-বিশিষ্ট, কারণবশতঃ তাহার গতিরোধ হইলে, তাহার অবস্থাকে আমরা স্থিরতা বা স্থিতি বলি। যে শিলাখণ্ড, বা অট্টালিকাকে অচল বিবেচনা করিতেছি, বাস্তবিক তাহা মাধ্যাকর্ষণের বলে গতিবিশিষ্ট; নিম্নস্থ ভূমি তাহার গতি রোধ করিতেছে বলিয়া তাহাকে স্থির বলিতেছি। এ স্থির-তাও কাল্পনিক; পৃথিবীতলস্থ অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেছি যে, এই পর্ব্বত বা এই অট্টালিকা অচল, গতিশূন্য; বস্তুতঃ উহার কেহই অচল বা গতিশূন্য নহে, পৃথিবীর উপরে থাকিয়া উহা পৃথিবীর সঙ্গে আবর্ত্তন করিতেছে। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিতে গেলে, জগতে কিছুই গতিশূন্য নহে।

কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। যাহা পৃথিবীর গতিতে গতি-বিশিষ্ট, তাহাকে চঞ্চল বলিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। তথাপি পৃথিবীতে এমত কোন বস্তু নাই, যে মুহূর্ত্তজন্য স্থির।

চারিপার্শ্বে চাহিয়া দেখ, বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষপত্র সকল নাচিতেছে, জল চলিতেছে, জীব সকল নিজ নিজ প্রয়োজন-সম্পাদনার্থ বিচরণ করিতেছে। পরন্তু ইহার মধ্যেও কোন কোন বস্তু গতিশূন্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু মাধ্যা-কর্ষণে বা অন্যপ্রকারে রুদ্ধ বাহ্য গতি ভিন্ন, ঐ সকল বস্তুর অন্য গতি আছে। সেই সকল গতি আভ্যন্তরিক।

বস্তু মাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে তাপ আছে। যাহাকে শীতল বলি, তাহা বস্তুতঃ তাপশূন্য নহে। তাপের অল্পতাকেই শীতলতা বলি, তাপের অভাব কিছুতেই নাই। যে তুষারখণ্ডের স্পর্শে অঙ্গচ্ছেদের ক্লেশানুভব করিতে হয়, তাহাতেও তাপের অভাব নাই—অল্পতা মাত্র।

যাহাকে তাপ বলি, তাহা পরমাণুগণের আন্দোলনমাত্র। কোন বস্তুর

পরমাণুসকল পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাড়িত হইলে, তাহা তরঙ্গবৎ আন্দোলিত হইতে থাকে। সেই ক্রিয়াই তাপ। যেখানে সকল বস্তুই তাপযুক্ত, সেখানে সকল বস্তুর পরমাণুই অহরহ পরস্পর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট, সন্তাড়িত এবং সঞ্চালিত। অতএব পৃথিবীস্থ সকল বস্তুই আভ্যন্তরিকগতি-বিশিষ্ট।

আলোক সম্বন্ধেও সেই কথা। ইথর নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণুসমষ্টির তরঙ্গবৎ আন্দোলনই আলোক। সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণু সকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। সেই প্রকার, তাপীয়তরঙ্গের সহিত ত্বগিন্দ্রেয়ের সংস্পর্শে তাপ অনুভূত করি। এই সকল আন্দোলনক্রিয়া মনুষ্যের দৃষ্টির অগোচর—উহা তাপরূপে এবং আলোকরূপেই আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি— অন্য রূপে নহে। তবে এই আন্দোলনক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কারণ কি? ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা, তাহা স্বীকার করিবার বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা এস্থলে বর্ণনীয় নহে।

পৃথিবীতলে আলোক সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। অতি অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রিতেও, পৃথিবীতল একেবারে আলোকশূন্য নহে। অতএব সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা আলোকীয় আন্দোলনের গতি বর্ত্তমান।

বিজ্ঞানবিদেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আলোক, তাপ এবং মাধ্যাকর্ষণ তিনটীই পরমাণুর গতিমাত্র। অতএব পৃথিবীর সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক-গতি-বিশিষ্ট। যৌগিক আকর্ষণের বলে, সেই সকল গতিসত্ত্বেও, কোন বস্তুর পরমাণুসকল বিস্রস্ত ও পৃথগ্‌ভূত হয় না।

পৃথিবীতলে এইরূপ। তার পর, পৃথিবীর বাহিরে কি?

পৃথিবী স্বয়ং অত্যন্ত প্রখরবেগবিশিষ্টা, এবং অনন্তকাল আকাশমার্গে ধাবমানা। পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যাহা সৌর জগতের অন্তর্গত, তাহাও পৃথিবীর মত অবস্থাপন্ন, সন্দেহ নাই। সেই সকল গ্রহ উপগ্রহে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাও পার্থিবপদার্থের ন্যায় সর্ব্বদা বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক গতি বিশিষ্ট। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের দৌরবীক্ষণিক অনুসন্ধানে সে কথায় অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

সূর্য্য নামে যে বৃহৎ বস্তু এই সৌরজগতের কেন্দ্রীভূত; উহা যেরূপ চাঞ্চল্যপূর্ণ, তাহা মনুষ্যের অনুভবশক্তির অতীত। যে সূর্য্যমণ্ডলের তাপ, আলোক, আকর্ষণ এবং বৈদ্যুতাদিকী শক্তি পৃথিবীস্থ গতিমাত্রেরই কারণ, সেই সূর্য্যমণ্ডলোপরি বা তদভ্যন্তরে যে নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত গতি নিয়ত বর্ত্তিবে, তাহা বলা বাহুল্য।

কিন্তু সূর্য্যোপরি এবং সূর্য্যগর্ভেই যে নিয়ত গতির আধিপত্য, কেবল ইহাই নহে। সূর্য্য স্বয়ং গতিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানবিদেরা স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্য স্বয়ং এই তাবৎ সৌরজগৎকে সঙ্গে লইয়া, প্রতি সেকেণ্ডে ৪৸৹ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭১০০ মাইল আকাশ-পথে ধাবিত হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর বেগে এই পদার্থরাশি কোথায় যাইতেছে? কেহ বলিতে পারে না কোথায় যাইতেছে। আকাশের একটী নাক্ষত্রিক প্রদেশকে ইউরোপীয়েরা হরক্যুলিজ বলেন। সূর্য্য তন্মধ্যস্থ লাম্‌ডা নামক নক্ষত্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কেবল এই পর্য্যন্তই নিশ্চিত হইয়াছে।

কিন্তু সূর্য্য এবং সৌরজগৎ ত বিশ্বের অতি ক্ষুদ্রাংশ। অন্ধকার রাত্রে অনন্ত আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক জ্বলিতে থাকে, তাহারা সকলেই এক একটী সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত। সে সকল কি গতিশূন্য? তাহাদিগেরও প্রাত্যহিক উদয়াস্তাদি গতি দেখিতে পাই, সেও পৃথিবীর প্রাত্যহিক আবর্ত্তনজনিত চাক্ষুষ ভ্রান্তি মাত্র। নাক্ষত্রিক লোকেও কি জগৎ চঞ্চল?

জ্যোতির্ব্বিদ্যার দ্বারা যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, ততদূর জানিতে পারা গিয়াছে, যে নক্ষত্রলোকেও গতি সর্ব্বময়ী। যত অনুসন্ধান হইতেছে, ততই বুঝা যাইতেছে যে সূর্য্যের যে প্রকৃতি নক্ষত্র মাত্রেরই সেই প্রকৃতি। গ্রহভিন্ন অন্য তারাকে নক্ষত্র বলিতেছি।

কতকগুলি নক্ষত্র সৌর গ্রহগণের ন্যায় বর্ত্তনশীল। যেখানে আমরা চক্ষে একটী নক্ষত্র দেখিতে পাই, দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে, তথায় কখন কখন দুইটী, তিনটী বা ততোধিক নক্ষত্র দেখা যায়। কখন কখন ঐ দুই তিনটী নক্ষত্র পরস্পরের সহিত সম্বন্ধরহিত, এবং পরস্পর হইতে দূরস্থিত, অথচ দর্শক যেখান হইতে দেখিতেছেন, সেখান হইতে দেখিতে গেলে আকাশের এক·

দেশে স্থিত দেখায়, এবং একটী সরল রেখার মধ্যবর্ত্তী হইয়া যুগ্ম নক্ষত্রের ন্যায় দেখায়। কিন্তু কখন কখন দেখা যায় যে, যে নক্ষত্রদ্বয় দেখিতে যুগ্ম, তাহা বাস্তবিক যুগ্মই বটে,—পরস্পরের নিকটবর্ত্তী এবং পরস্পরের সহিত নৈসর্গিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এই সকল যুগ্মাদি নক্ষত্র সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা পর্য্যবেক্ষণা ও গণনার দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, উহারা পরস্পরকে বেড়িয়া বর্ত্তন করিতেছে। অর্থাৎ যদি ক, খ, এই দুইটী নক্ষত্রে একটী যুগ্ম নক্ষত্র হয়, তবে ক, খ, উভয়ের মাধ্যাকর্ষণিক কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে ক, খ, উভয় নক্ষত্র বর্ত্তন করিতেছে। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ দুইটী কেন, বহু নক্ষত্রে এক একটী নাক্ষত্রিক জগৎ। তন্মধ্যস্থ বিভক্ত নক্ষত্রগুলি সকলই ঐ প্রকার আবর্ত্তনকারী। বিচিত্র এই যে, নিউটন, পৃথিবীতে বসিয়া, পার্থিব পদার্থের গতি দেখিয়া, পার্থিব উপগ্রহ চন্দ্রের গতিকে উপলক্ষ করিয়া, যে সকল মাধ্যাকর্ষণিক গতির নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, দূরবর্ত্তী এবং সৌরজগতের বহিঃস্থ এই সকল নক্ষত্রের গতিও সেই সকল নিয়মের অধীন।

নক্ষত্রগণের প্রকৃতি এবং সূর্য্যের প্রকৃতি যে এক, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ডাক্তার হুগিন্‌স্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা আলোক-পরীক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে জানিয়াছেন যে, যে সকল বস্তুতে সূর্য্য নির্ম্মিত, অন্যান্য নক্ষত্রেও সেই সকল বস্তু লক্ষিত হয়। অতএব সূর্য্যোপরি ও সূর্য্যগর্ব্ভে যে প্রকার ভয়ঙ্কর কোলাহল ও বিপ্লব, নিত্য বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হয়, তারাগণেও সেইরূপ হইতেছে, সন্দেহ নাই। যে নক্ষত্র দূরবীক্ষণ সাহায্যেও অস্পষ্ট দৃষ্ট আলোকবিন্দু বলিয়া বোধ হয়, তাহাতে ক্ষণমাত্রে যে সকল উৎপাত ঘটিতেছে, পৃথিবীতলে দশবর্ষের নৈসর্গিক ক্রিয়া একত্র করিলেও তাহার তুল্য হইবে না। সূর্য্যমণ্ডলে সামান্যমাত্র কোন পরিবর্ত্তনে যে বিপ্লব ও নৈসর্গিক শক্তিব্যয় সূচিত হয়, তাহাতে পলকমাত্রে এই পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রচণ্ড বাত্যার কল্লোল অথবা কর্ণবিদারক অশনি-সম্পাত-শব্দ হইতে লক্ষ লক্ষ লক্ষগুণে ভীমতর কোলাহল অনবরত সেই সৌরমণ্ডলে নির্ঘোষিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আর, এই যে সহস্র সহস্র স্থির, শীতল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ দেখিতেছি, তাহাতেও সেইরূপ হইতেছে, কেননা সকলই সূর্য্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট, বরং আমাদিগের সূর্য্য অনেক অনেক নক্ষত্রের

অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং হীনতেজা। সিরিয়স নামক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, আমাদিগের নয়ন হইতে যতদূর আছে, আমাদিগের সূর্য্য ততদূরে প্রেরিত হইলে, উহা তৃতীয়শ্রেণীর ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় দেখাইত; আকাশের কত শত নক্ষত্র তদপেক্ষা উজ্জ্বল জ্বালায় জ্বলিত! কিন্তু যদি সূর্য্যকে অলদেবরণ (রোহিণী), কস্তর, বেটেলগুস্ প্রভৃতি নক্ষত্রের স্থানে প্রেরণ করা যায়, তবে সূর্য্যকে দেখা যাইবে কি না সন্দেহ। প্রকুটর সাহেব বলেন যে, আকাশে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, বোধ হয় তাহার মধ্যে পঞ্চাশটীও আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে না। অতএব সূর্য্যমণ্ডলে যেরূপ চাঞ্চল্যের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, অধিকাংশ নক্ষত্রে ততোধিক চাঞ্চল্য বর্ত্তমান, সন্দেহ নাই।

কেবল তাহাই নহে, সূর্য্য যেমন অতি প্রচণ্ডবেগে, গ্রহগণ সহিত,আকাশ-পথে ধাবমান, অন্যান্য নক্ষত্রগণও তদ্রূপ। বরং অনেক নক্ষত্রের বেগ সূর্য্যাপেক্ষা প্রচণ্ডতর। সিরিয়সের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল, ঘণ্টায় ৭২০০০ মাইল। বেগা নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ মাইল, ঘণ্টায় ১৮০০০০ মাইল; কস্তর প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ মাইল, ঘণ্টায় ৯০০০০ মাইল। পোলাক্সের গতি সেকেণ্ডে ৪৯ মাইল, প্রায় বেগার ন্যায়। সপ্তর্ষির মধ্যে পাঁচটির গতি সিরিয়সের ন্যায়, একটির গতি বেগার ন্যায়। এই বেগ অতি ভয়ঙ্কর। বিশেষ, যখন মনে করা যায় যে এই সকল প্রচণ্ডবেগশালী পদার্থের আকার অতি প্রকাণ্ড (সিরিয়স সূর্য্যাপেক্ষা সহস্রগুণ বৃহৎ) তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

নক্ষত্র সকল অদ্ভুতগতিবিশিষ্ট হইলেও, চারি সহস্র বৎসরেও তত্তাবতের স্থানভ্রংশ মনুষ্যচক্ষে লক্ষিত হয় নাই। ঐ সকল নক্ষত্রের অসীম দূরতাই ইহার কারণ। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সাহায্যে, বিচিত্র মান যন্ত্র ও বিদ্যাকৌশলের বলে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুতি পর্য্যবেক্ষিত করিয়াছেন। তাহাতেই ঐ সকল গতি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

নাক্ষত্রিক গতিতত্ত্ব অতি বিচিত্র। গগনের এক দেশে স্থিত নক্ষত্রঃ একদিকেই ধাবমান না হইয়াও নানাদিকে ধাবমান। কখন বা একদিকে ধাবমান। কোথায় ধাবমান? কেন ধাবমান? সে সকল তত্ত্বের আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন, এবং এক প্রকার অসাধ্য।

যাহা বলা গেল, তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, গতিই জাগতিক নিয়ম—স্থিতি নিয়মরোধের ফলমাত্র। জগৎ সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুঝিতে গেলে, অতি বিস্ময়কর বোধ হয়। জীবনাধারে, শোণিতাদির চাঞ্চল্যই জীবন। হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও, দৈহিক পরমাণু মধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্যসঞ্চারি হইয়া, দেহধ্বংস হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইখানে চাঞ্চল্য; সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী। যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বেকন

উচ্চপদ।

অনেকে উচ্চপদ কামনা করেন, কিন্তু উচ্চপদে অসুখ বিস্তর। উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিকে পরের মন রক্ষা ও মানের ভয়ের নিমিত্ত সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন ও খিদ্যমান থাকিতে হয়, শরীর সময় ও কর্ম্ম কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকে না, কার্য্যচিন্তা দ্বারা স্বাস্থ্যক্ষয় হয় এবং ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মে সময় ক্ষেপ করিবার যো থাকে না। অন্যের উপর প্রভুতার নিমিত্ত আপনার উপর প্রভুতা খোয়ান এক প্রকার মূঢ়ের কর্ম্ম। কোন পদে অধিরোহণ করাও সহজ নহে, তেজস্বী বা নিতান্ত ধার্ম্মিকের কর্ম্ম নয়। পদ-প্রার্থীরা কত কষ্টের পর কষ্টতরে পড়ে এবং কত অবমানের পর মানের মুখ দেখিতে পায়। উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির একবার মাত্র একটী মহৎ কর্ম্ম করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে হয় না, উত্তরোত্তর অবদানপরম্পরা দ্বারা লোককে চমৎকৃত রাখিবার চেষ্টা পাইতে হয়। একটী প্রমাদ বা স্খলিত হইলে, তাহাতেই দেশের লোকের চোখ্ পড়ে এবং তাহারা তিল-প্রমাণ দোষকে তাল প্রমাণ করিয়া তুলে। উন্নত পদ অনুবীক্ষণস্বরূপ, উহাতে অনুমাত্র দোষ বা গুণ বড় দেখায়। ঝটিতি পরিত্যাগ করাও সহজ নয়, উচিত বোধ হইলেও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না এবং ইচ্ছা হইলেও লোভ সম্বরণ করা যায় না। বিশেষতঃ যাহারা লোকের নিকট কিছু দিন মান সম্ভ্রমে কাটাইয়াছে, তাহারা অপ্রকাশ্য রূপে থাকিতে ভাল বাসে না। সকলে বড় পদ স্পৃহণীয় এবং বড় লোকদিগকে সুখী মনে করে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের সুখের লেশমাত্র নাই। তাহারা পরের মুখে অন্ন চাকে এবং আপনাদিগের অন্তরে অনুসন্ধান করিলে দুঃখ বই সুখের হেতু কিছুই দেখিতে পায় না। আপনারা যে, দুঃখের ভাগী শীঘ্রই বুঝিতে পারে; কিন্তু আপনারা যে দোষের ভাগী, তত শীঘ্র বোধ করিতে পারে না। তাহা-দিগের চিত্ত কার্য্যচিন্তায় এত কবলিত ও ব্যাসক্ত থাকে যে, আত্মানুসন্ধান

করিবার অবকাশ থাকে না। সকলের কাছে পরিচিত থাকিয়া আপনার কাছে অপরিচিত থাকা এক প্রকার বিপদ সন্দেহ নাই।

বড় পদ হইলে পরের ভাল ও মন্দ দুইই করিবার ক্ষমতা হয়, কিন্তু মন্দ করিবার ক্ষমতা থাকা অতি ভয়ানক। শক্তিসত্ত্বে ক্ষমা করা অতি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু মনুষ্যের হস্তে মন্দ করিবার শক্তি না থাকাই ভাল। যাহা হউক, ভাল করিবার নিমিত্ত পদ প্রার্থনা করা কোন ক্রমেই দূষণীয় নহে, বরং ন্যায্য ও প্রশংসনীয়। অনেকের আশয় অতি সৎ এবং পরের হিতানুষ্ঠানে ঐকান্তিক ইচ্ছা, কিন্তু ক্ষমতা ও সুযোগ বিরহে সে মনোরথ সিদ্ধ হয় না। পরন্তু উত্তম পদে অধিরূঢ় হইলে, অনেক সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। শুদ্ধ সদাশয় হইলেই ধার্ম্মিক হওয়া হয় না, সৎকর্ম্মাও হওয়া চাই। উচ্চ পদে থাকিয়া লোকের হিতকর অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, অন্তঃকরণে এক প্রকার স্বসম্বেদ্য সন্তোষের উদয় হয়।

কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে মহাজনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে এবং এরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে যে, লোকে তোমারও দৃষ্টান্ত এক সময়ে অনুসরণ করে। যাহারা তোমার পদে অপদস্থ হইয়াছে বা অযশ লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের দৃষ্টান্তও উপেক্ষা করিবে না। মুখে তাহাদিগের দোষ ঘোষণা করিবার প্রয়োজন নাই, তবে যাহাতে তোমার সে সকল দোষ না ঘটে, কেবল তদ্বিষয়ে সাবধান থাকিবে। কুরীতিসংশোধনের সময় পরের নিন্দা বা নিজের দাম্ভিকতা প্রকাশ করিও না। কোন চিরাগত প্রথা উঠাইতে হইলে, দেখিও যেন মন্দের সহিত ভালও উঠিয়া না যায়, প্রথমতঃ ঐ প্রথা কিরূপে, কি উদ্দেশে, কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, অনুসন্ধান করিবে এবং উহার কোন্ অংশ দূষিত বা বর্ত্তমান সময়ের সহিত সামঞ্জসীভূত হইতেছে না, তাহাও বিবেচনা করিবে।

এরূপ নিয়মে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, যেন লোকে অগ্রেই বুঝিতে পারে যে, কোন উপস্থিত বিষয়ে তুমি কিরূপ আচরণ করিবে। তাহা বলিয়া নিয়মরক্ষার্থ নিতান্ত অভিনিবিষ্ট বা উদ্ধত হইও না। অবসর মতে কখন কখন নিয়মের উল্লঙ্ঘনও করিতে হইবে এবং যখন নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে তখন বিশদরূপে উল্লঙ্ঘনের আবশ্যকত্ব সমর্থন করিবে।

তোমার পদের ক্ষমতা রক্ষা করিবে, দেখিও যেন উহা তোমার অধিকারচ্যুত না হয়। কণ্ঠতঃ বিবাদ না করিয়া, কার্য্যতঃ ক্ষমতা অগ্রেই গ্রহণ করিবে। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতাতেও হস্তার্পণ করিও না, সকল কাজেই স্বয়ং ব্যস্ত না হইয়া বরং নেতৃত্ব করাই সমধিক মানাস্পদ জানিবে। কার্য্যনির্ব্বাহের সময় কাহারও সাহায্য বা পরামর্শে অবহেলা করিও না, স্থির চিত্তে হেয়োপাদেয় বিবেচনাপূর্ব্বক সমুচিত ব্যবহার করিবে।

ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দেশ করিয়া রাখিবে; হাতের কাজ অগ্রে সমাধান করিবে; উহা নিষ্পন্ন না হইলে, অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে না। তাহা হইলেই সুষ্ঠুরূপে সকল কর্ম্ম সময়ে নির্ব্বাহ করিবার সম্ভাবনা।

পদস্থ ব্যক্তির প্রধান দোষ উৎকোচ-গ্রহণ। শুদ্ধ তোমার ও তোমার অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের হস্ত উৎকোচে অদূষিত থাকিলেই হয় না, অর্থীরাও যেন তদ্বিষয়ে কথা কহিতেও সাহসী না হয়। তোমাকে নিজে ত নিরামিষ হইতেই হইবে, আর আমিষের উপরে এরূপ বলবৎ দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিবে, যেন লোকে তোমাকে সন্দেহ করিতেও না পারে। যদি স্পষ্ট কারণ না দেখাইয়া, মত পরিবর্ত্ত কর, তাহা হইলে লোকের মনে নানা সন্দেহের উদয় হয়; অতএব মত-পরিবর্ত্ত করিবার সময় সুব্যক্তরূপে কারণ ব্যক্ত করিবে। যদি কোন কর্ম্মচারী বা ভৃত্য তোমার অসম্ভব প্রিয়পাত্র হয়, তবে তাহাকে লোকে উৎকোচ-গ্রহণের অপ্রকাশ্য দ্বার মনে করে।

কর্কশ হইও না। অনর্থক কার্কশ্য প্রয়োগপূর্ব্বক লোককে চটাইবার আবশ্যকতা কি? খর হইলে লোকে ভয় করে বটে, কিন্তু কর্কশকে লোকে ঘৃণা করে। তর্জ্জন বা তিরস্কার করিবার সময়েও বিদ্রূপ করা উচিত নয়। আপনার আসনস্থ হইয়া সুহৃজ্জন বা গুরুজনের অনুরোধ রক্ষার্থ ন্যায় ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিও না। অনুরোধ বা উপরোধ রক্ষার্থ, কর্ত্তব্য-অবহেলন, উৎকোচ-গ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ। সকলের কিছু উৎকোচ দিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কোনপ্রকার অঙ্গাঙ্গীভাব অনুসন্ধানপূর্ব্বক উপরোধ জুটাইয়া আনা অতি সহজ; সুতরাং এরূপ পক্ষপাতী ব্যক্তির সর্ব্বদাই অপথে পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা। একটী প্রাচীন গাথা আছে, "পদস্থ হইলে

লোকের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তখন সজ্জন বা দুর্জ্জন অনায়াসেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে।”

পদস্থ হইয়া অনেকের নানা দোষ সংশোধিত হইতে দেখা যায়। মান ও সম্ভ্রম লাভানন্তর কুপ্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন করা, অশংসয়িত অর্হতা ও সুপাত্রতার লক্ষণ। যদি দলাদলি থাকে, তবে উচ্চপদ হস্তগত করিবার সময়, কোন দলে প্রবিষ্ট হইলে তত হানি নাই; কিন্তু হস্তগত হইলেই একেবারে সব দলে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবে; তখন দলবিশেষে পক্ষপাত করা অতি অন্যায়। তোমার পদে যাঁহারা অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদিগের দোষ ঘোষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করিও না; তাহা হইলে পদচ্যুত হইলে তোমার বেলা লোকে উহার শোধ তুলিবে। বরং নব নব কৃতিত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার গুণ সকল বিস্মারিত করিবার চেষ্টা পাও। সহকারী ব্যক্তিদিগের আদর অবেক্ষা করিবে, মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। যে সকল বিষয়ে পরামর্শ প্রদানে অধিকার নাই, তাহারা সে সকল বিষয়ে অভ্যন্তরীকৃত হইলে, তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইবে। অর্থিগণের নিকট বা সুহৃদ্গোষ্ঠীতে অবিশ্রম্ভ সংলাপের সময়, তোমার পদের গৌরবের দিকে দৃষ্টি রাখিও না; কিন্তু আসনে বসিয়া যেন তুমি সে নও এইরূপ ভাণ করিবে।

ব্যয়।

ধন, শুদ্ধ মান ও সৎ কর্ম্মে ব্যয়ের নিমিত্ত; ধনে আর কিছু প্রয়োজন নাই। অতএব ধর্ম্ম কর্ম্মে বিত্তশাঠ্য করা অতি গর্হিত। স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত অবসরে স্বর্ব্বস্ব ব্যয় করাও দূষণীয় নহে, কিন্তু সচরাচর সাংসারিক ব্যয় করিবার সময় ওজন বুঝিয়া চলা উচিত। এখন উদার ও মুক্তহস্ত হইলে পরিণামে রিক্তহস্ত হইতে হইবে। আর সাবধান থাকা উচিত, যেন উপজীবিগণ কোনরূপে না ঠকাইতে পারে। বাহিরে এরূপে সম্ভ্রম রক্ষা করিবে যে, লোকে যত মনে করে তদপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহ হয়। যদি শুদ্ধ স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইলেই পরিতুষ্ট হও, তবে আয়ের অর্দ্ধেক ব্যয় করিবে, আর যদি সম্পন্ন হইতে চাও তবে তৃতীয়াংশ মাত্র

হাজার বড় হইলেও, আপনার বিষয় আপনি পর্য্যবেক্ষণ করা কখন ক্ষুদ্রতার কর্ম্ম নহে। পাছে ভগ্ন দশা দেখিয়া বিষণ্ণ হইতে হয়, এই বলিয়া অনেকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে উপেক্ষা করেন; কিন্তু তাহা হইলে উত্তরোত্তর আরও ভগ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিকারস্থান না দেখিলে কিরূপে প্রতীকারের আরম্ভ হইতে পারে? যাঁহারা স্বয়ং বিষয় রক্ষা না করেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মকর্ত্তা মনোনীত করিবার সময় অনেক বাছিতে হয় ও মধ্যে মধ্যে কর্ম্মকর্ত্তার পরিবর্ত্ত করিতে হয়; নতুবা পুরাতন কর্ম্মকর্ত্তারা কিছু দিনের পর প্রভুর রাশি বুঝিয়া লয় এবং ক্রমে ভয়ভাঙা হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশপূর্ব্বক স্বার্থসাধন করিতে ত্রুটি করে না।

যদি আহারের পারিপাট্যবিষয়ে প্রভূত ব্যয় কর, তবে পরিচ্ছদের ব্যয় কমাইতে হইবে। যদি ভদ্রাসনে অনেক আড়ম্বর প্রকাশ কর, তবে যানবিষয়ে মিতব্যয়ী হইতে হইবে। নতুবা একেবারে চারি দিকে মুক্তহস্ত হইলে, অচিরাৎ উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা।

যদি ঋণ থাকে, ক্রমে পরিশোধ কর; একেবারে আনৃণ্যগ্রহণার্থ সহসা বিষয় বিক্রয় করিলে উচিত মূল্য হইবে না, অবশ্য ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। ক্রমে পরিশোধনের আর এক গুণ এই যে, মিতব্যয়িতা অভ্যাস হইয়া আইসে। কিন্তু একেবারে শুধিয়া ফেলিলে, আবার অপ্রতুল ও আবার ঋণগ্রহণ করিতে হইবে।

যাঁহাকে বিষয় ঋণমুক্ত করিতে হইবে, তাঁহার অতি অল্প ব্যয়ে কুণ্ঠিত হওয়া নিন্দনীয় নহে। নিতান্ত অল্প হইলেও, ব্যয়বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক। অল্প আয়ের নিমিত্ত ব্যস্ত হওয়া ক্ষুদ্রের কর্ম্ম বটে, কিন্তু অল্প ব্যয়ে বিমুখ হওয়া কখনই তাদৃশ দূষণীয় নহে। নিত্য কর্ম্মে ব্যয়বাহুল্য করিতে হইলে, সবিশেষ বিবেচনা করিবে; কিন্তু নৈমিত্তিক কর্ম্মে স্থূললক্ষ্য হইলে হানি নাই, বরং কার্পণ্য প্রকাশ করিলে অসম্ভ্রম ও নিন্দা হয়। অতুল ঐশ্বর্য্য নিতান্ত আবশ্যক নহে, বিতরণ ভিন্ন উহার আর কিছু প্রয়োজন নাই; প্রত্যুত উহার রক্ষণার্থ সর্ব্বদাই খেদ প্রাপ্ত হইতে হয় এবং অনেক গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ থাকে না। যাহা এত অপর্য্যাপ্ত যে, কখনই এক জনের ভোগে আসিতে পারে না, তাহার অধিকারী বলিয়া

অভিমান করা এক প্রকার অজ্ঞানের কর্ম্ম। আপদার্থ ধন রক্ষা করিবে শাস্ত্রে আছে বটে এবং মনুষ্যজাতির পদে পদে এত বিপদ যে, উত্তরকালের সংস্থান রাখিয়া চলা আবশ্যক বটে; কিন্তু ধনের নিমিত্ত যে অধিকাংশ লোক বিপদে পতিত বা বিপদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা সন্দেহস্থল।

অভিমানপ্রকাশ বা জাঁকজমকের নিমিত্ত ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা করিও না। যাহা ন্যায়তঃ অর্জ্জন করিবে, তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকিবে এবং ব্যয় ও বিতরণ করিতে কাতর হইবে না। সংসারী ব্যক্তির ধনে একেবারে অলম্বুদ্ধি করাও উচিত নহে, আপনার ও অন্যের উপকারার্থে সৎপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করা কোন ক্রমেই দূষণীয় নহে। সত্বর সম্পন্ন হইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইও না, তাহা হইলে ধর্ম্মরক্ষা হইবে না। ধর্ম্ম বাঁচাইয়া হঠাৎ বড় মানুষ হইতে প্রায় দেখা যায় নাই।

মিতব্যয়িতাই সম্পন্ন হইবার প্রধান উপায়। কিন্তু উহাও নিতান্ত নির্দ্দোষ নহে, উহাতে দানধর্ম্মরহিত, এবং দীন ও অনাথ ব্যক্তিদিগের আশা ভঙ্গ করিতে হয়। কৃষিকর্ম্মে অনেকে সম্পন্ন হয়েন। বসুমাতা প্রসন্ন হইয়া যাহার প্রতি শুভদৃষ্টি করেন, সে অতি ভাগ্যবান,-সন্দেহ নাই। এরূপে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে অধর্ম্ম বা অন্যায়ের লেশ নাই, বাস্তবিকও অধিক মূলধন লইয়া কৃষিকর্ম্ম করিলে সাতিশয় লাভ হয়।

বাণিজ্যে বিত্তোপার্জ্জন করাও দূষণীয় নহে। সকলের সহিত সাধু ব্যবহার ও পরিশ্রম করিতে পারিলেই বাণিজ্যে বিলক্ষণ লাভ হয়। কিন্তু একচেটিয়া করিয়া আপনি সর্ব্বগ্রাস করা অতি অন্যায়। সম্ভূয়সমুত্থানেও অনেকে বিলক্ষণ লাভ করেন। যদি সমুত্থায়ীরা সকলে সাধু হন ও পরস্পর বঞ্চনা না করেন, তবে উক্তরূপ ব্যবসা মন্দ নহে। কুসীদব্যবহারে কোন বিঘ্ন নাই, ইহাতে অর্থ প্রয়োগ করিলে কোন সংশয়ে আরোহণ করিতে হয় না; কিন্তু উহাতে আয় অতি অল্প।

কোন বিষয়ে অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করিতে পারিলে, অতিশীঘ্র ভাগ্যবন্ত হইবার সম্ভাবনা। এক ব্যক্তি কানেরি দ্বীপপুঞ্জে সর্ব্ব প্রথম ইক্ষুরোপণ করিয়া, অচিরাৎ অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ফলতঃ উত্তমরূপে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত অবসরে কোন বিষয়ে অভিনব কৌশল

উন্নয়ন করিতে পারিলে, নিতান্ত নিঃসম্বল ব্যক্তিও অচিরাৎ ভাগ্যধর বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন। যে ব্যবসাতে নিঃসংশয় লাভ হয়, তাহাতে কখন অধিক লাভ হয় না; আর যাহাতে একেবারে অধিক লাভের সম্ভাবনা, তথায় একেবারে সর্ব্বনাশেরও সম্ভাবনা। অতএব, যাহাতে লোকসান হইলেও মূলে-হাবাৎ হইতে হয় না এবং অন্যবারের লাভ দ্বারা পরিপূরিত হইতে পারে, এপ্রকার ব্যবসা অবলম্বন করা উচিত। যাহা এক্ষণে সুলভ, কিন্তু কিছু দিন পরেই দুর্ম্মূল্য ও অক্রেয় হইবে, বিবেচনাপূর্ব্বক এরূপ দ্রব্য কিনিয়া রাখিলে বিলক্ষণ লাভ হয়।

রাজসেবায়ও অনেকে সম্পন্ন হয় বটে; কিন্তু স্তব ও চাটুবচন দ্বারা পরের মন যোগাইয়া তদীয় প্রসাদ প্রার্থনা করা কোনরূপেই তেজীয়ানের কর্ম্ম নহে। সৎপথে থাকিয়া সেব্যজনের সন্তোষ জন্মান সহজ নহে। মরণকালীন সংবিভাগের প্রত্যাশা করিয়া অনেকে অন্যের অনুবৃত্তি করে। এরূপ লোক ততোধিক নীচ, সন্দেহ নাই। সর্ব্বথা পরভাগ্যোপজীবী ও পরপ্রত্যাশাপন্ন হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা, মনস্বিজনের পক্ষে সাতিশয় ক্লেশকর।

যাহারা মুখে অর্থে অনস্থাবুদ্ধি প্রকাশ করে, তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস করিও না। তাহারা অর্থের নিমিত্ত অনেকবার বিফলপ্রয়াস হইয়া, পরিশেষে একপ্রকার নির্ব্বিণ্ণ হইয়াছে, সুতরাং একেবারে উহার আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ রূপে আপনাদিগকে প্রবোধ দেয়।

কোন বিষয়ে বিত্তশাঠ্য করিও না, ব্যয় করিতে কাতর হইও না; ধন চিরস্থায়ী নহে, ধনের অনেক শত্রু আছে। কখন কখন আপনিও উহা উবিয়া যায়। যত ক্ষণ আছে, দান ভোগ দ্বারা সার্থক করিয়া লও। মরিবার সময় ধন সঙ্গে যাইবে না, হয় এক জন দায়াদ লইবে, নয় সাধারণের হিতার্থ কোন অনুষ্ঠানে বিনিযুক্ত হইবে। দায়াদের বয়স যদি অল্প হয় এবং বিবেকশক্তি সম্যক উন্মিষিত না হইয়া থাকে, তবে কতিপয় ধূর্ত্ত বিট তাহার সহিত জুটিয়া লুটিয়া খাইবে। আর যদি, অন্তিম কালে সাধারণের হিতার্থ অনুষ্ঠানে বিনিয়োগ করিয়া যাও, তাহা হইলেও মনে করিও না যে, উহার সদ্গতি হইল। তুমি অবিদ্যমানে উক্তরূপ অনুষ্ঠানের কখনই সমুচিত তত্ত্বাবধান হইবে না; উহা কিছুদিন পরেই, কেবল কতিপয় গৃধ্ররূপী পামরের আমিষস্বরূপ হইয়া উঠিবে।

রামকমল ভট্টাচার্য্য।

আর্য্যদর্শন

সৃষ্টি ও প্রলয়।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিষয়ে যত মত প্রচলিত আছে, তৎসমস্ত পাঁচটী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম মত এই—যেমন কুম্ভকার ঘটের, তেমনি ঈশ্বর বিশ্বের নির্ম্মাণকর্ত্তা; তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পৃথিবী প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে নানা নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সূর্য্যগ্রহণ হইতে পতঙ্গক্রীড়া পর্য্যন্ত জগতে যাবতীয় ক্রিয়ার নির্ব্বাহ হইতেছে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপ এই মতের অনুসরণ করেন; ভারতীয় পুরাণাদিও ইহার পক্ষপাতী। কিন্তু ইহাতে একটী আপত্তি আছে। কুম্ভকারের সহিত ঈশ্বরের সাদৃশ্য হইতে পারে না। কারণ, সে মৃত্তিকা না পাইলে ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারে না; সে ঘটের নিমিত্ত-কারণমাত্র; উহার উপাদান-কারণ মৃত্তিকা।

এ আপত্তি অপরিহার্য্য। বেদান্ত-দর্শন ইহার খণ্ডনার্থ, দ্বিতীয় মত প্রকাশ করেন। তাহার সারার্থ এই—পরমাত্মা জগতের কেবল নিমিত্ত-কারণ নহেন; তিনি উহার উপাদান কারণও বটেন। কুম্ভকার যেমন ঘট নির্ম্মাণ করে, তিনি তেমনি এই বিশ্বের রচনা করিয়াছেন; পরন্তু উহার উপাদানও নিজস্বরূপ হইতে প্রাদুর্ভূত করিয়াছেন। অর্থাৎ পরমাত্মা এই বিশ্বরূপ ঘটের কুম্ভকার ও মৃত্তিকা উভয়ই।

বেদান্তের এই সিদ্ধান্তও বিশদ নহে। যেহেতু, জগৎ ও জগৎকর্ত্তা যদি এক ও অভিন্ন, তবে সংসারে এত বৈষম্য দৃষ্ট হয় কেন? জ্ঞানাজ্ঞান, হিতাহিত, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ ইত্যাকার বিরুদ্ধ বিষয় সকলের কিরূপে সমাধান হইতে পারে? পরন্তু এই বিরুদ্ধভাব যখন জগতে দেদীপ্যমান দেখা যাইতেছে, তখন জগতের উপাদান পরব্রহ্মে না থাকিবার কারণ কি? এই আপত্তির পরিহারার্থ বৈদান্তিকেরা মায়ার কল্পনা করেন। তাঁহারা বলেন

যে, মায়ার প্রভাবেই জগৎকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ বোধ হয় এবং সুখদুঃখাদি বৈষম্যের ভ্রম জন্মে।

তত্ত্বজ্ঞানবলে সেই মায়ার অপগম হইলেই, তাদৃশ ভ্রম তিরোহিত হইয়া যায়। কিন্তু এখন কথা হইতেছে, মায়া পরমাত্মা হইতে পৃথক্ কিনা? যদি পৃথক বল, তাহা হইলে, উহার উৎপত্তি বিনা উপাদানে ঘটিয়া উঠে। আর যদি মায়া ও পরমাত্মা একই পদার্থ বল, তবে এই আপত্তি হইতে পারে যে, নিত্যজ্ঞানময় পরব্রহ্ম হইতে অবিদ্যা-স্বরূপ মায়ার কিরূপে উদ্ভব হওয়া সম্ভবে?

বেদান্তদর্শনের উক্তদোষ দর্শন করিয়া নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, ঈশ্বর শূন্য হইতে জগতের সৃষ্টি করেন নাই বটে; কিন্তু তিনি ইহার কেবল নিমিত্ত কারণ; উপাদান কারণ নহেন। জগতের উপাদান-কারণ পরমাণু। যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা লইয়া ঘট প্রস্তুত করে, তদ্রূপ ঈশ্বর পরমাণু লইয়া বিশ্ব রচনা করেন। পরমাণু ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী। ঈশ্বর একটী পরমাণুরও সৃষ্টি করিতে পারেন না। কেবল পরমাণুপুঞ্জের সংশ্লেষ ও সমাধান করিয়া, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। ন্যায়ের মত তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাতেও আপত্তি আছে; কারণ, ঈশ্বর যদি সৃষ্টি-বিষয়ে স্বতন্ত্র হইলেন না, পরমাণুর অধীন হইলেন; তবে বিশ্বরাজ্যের শাসন-বিষয়েও তাঁহার স্বাতন্ত্র্য নাই, এরূপ আপত্তি হইতে পারে। যাঁহার শক্তি একস্থলে সঙ্কুচিত হইল; তাঁহার শক্তি অন্যান্যস্থলে নিয়ত অব্যাহত থাকিবে কেন?

সাঙ্খ্যেরা চতুর্থ মত প্রকটন করেন। তাঁহারা বলেন, জগতের নিমিত্ত-কারণ নাই। প্রকৃতিই (Nature) উহার উপাদান-কারণ। প্রকৃতির নানা পরিবর্ত্তনে ক্রমে পাঁচ প্রকার সূক্ষ্ম তন্মাত্র জন্মে; তাহা হইতে পঞ্চ মহাভূত; পঞ্চমহাভূত হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বের উদ্ভব হয়। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণের আধার। সুতরাং প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত পদার্থে ঐ তিন গুণের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ থাকাতে, জগতে এত বৈষম্য ও বিচিত্রতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বিশ্বসংসারের যাবতীয় কার্য্য প্রকৃতি হইতে সম্পাদিত হয়। চেতনরূপী পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা তৎসমুদায়ের

ফলভোগ করেন। পুরুষ নিজে ক্রিয়াশূন্য ; তবে যে তাঁহাকেও ক্রিয়াবান্ বলিয়া বোধ হয়, সে কেবল প্রকৃতির ক্রিয়া দ্বারা। যেমন সন্নিহিত গোলাপ ফুলের আভায় স্ফটিকমণিকে রক্তবর্ণ দেখায়, তদ্রূপ পুরুষের ক্রিয়াবত্তা ভ্রম কল্পিতমাত্র। সাঙ্খ্যমতে উপরি-উক্ত মতত্রয়ের আপত্তি গুলি নিরস্ত হইতেছে। সাঙ্খ্যেরা খৃষ্টান ও পৌরাণিকদিগের মত বিনা উপাদানে জগতের সৃষ্টি মানেন না ; কারণ প্রকৃতিই ইহার উপাদান। তাঁহারা বৈদান্তিকের ন্যায় সুখদুঃখাদি বৈষম্যকে ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দেন না ; আদি কারণ প্রকৃতি ও তৎকার্য্য জগৎ উভয়েতেই উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বেদান্তমতে পরমাত্মাতে সুখদুঃখাদির সত্ত্বা মানিলে, তাঁহার ঈশ্বরত্বের ব্যাঘাত জন্মে। সাঙ্খ্যেরা নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় আদি কারণকে, পরমাণুর পরতন্ত্র বলিয়া, স্বীকার করেন না; কিন্তু উহাকে পরমাণুরও উৎপাদক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। অতএব তাঁহাদিগের মতে কোন স্থলেই আদিকারণ প্রকৃতির সর্ব্বশক্তিমত্তার সঙ্কোচ নাই। সাঙ্খ্যেরা নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু চার্ব্বাকের ন্যায় আত্মাকে জড়পদার্থ হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না এবং দেহের পতনে সকল শেষ হইল একথা বলেন না। তাঁহারা পরকাল, পাপপুণ্য ও আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করেন এবং ইহাও বলেন যে, জ্ঞান ও বৈরাগ্যবলে নানা জন্মের পর পরিণামে মোক্ষলাভ হইতে পারে ; অর্থাৎ জন্ম, জরা, মরণাদিস্বরূপ সংসারের ক্লেশপরম্পরা হইতে জীবের মুক্তিলাভ হইতে পারে।

পঞ্চম মত ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা প্রকটন করিয়াছেন। অনেকানেক উচ্চ শ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞানী এই মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন। তথাপি ইহাকে আপাততঃ স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে ইহার অনুকূলে এতদূর পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সৃষ্টিপ্রক্রিয়াসম্বন্ধে যত মত প্রকটিত হইয়াছে, তৎসমস্ত অপেক্ষা ইহাতে কল্পনার অনেক অল্প সংস্রব দৃষ্ট হয়। অনেকে এরূপ আশা করেন যে, ভবিষ্যতে মনুষ্যজাতির বিদ্যাবুদ্ধির যত উন্নত অবস্থা হইবে, ততই ইহার দৃঢ়ীকরণার্থ প্রমাণপ্রয়োগ লব্ধ হইতে থাকিবে।

পঞ্চম মতের সারার্থ এই। আদৌ নভোমণ্ডল কেবল পরমাণুরাশিতে

ব্যাপ্ত ছিল। পরমাণুর দুই শক্তি আছে, আকর্ষণ ও অপসারণ। আকর্ষণ শক্তি দ্বারা পরমাণুসকল পরস্পরকে ক্রমশঃ সংশ্লিষ্ট করে, আর অপসারণ-শক্তি অনুসারে তাহারা পরস্পর ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে। এই বিশ্বসংসারে উক্ত দুই শক্তির বিচিত্র সামঞ্জস্য আছে। কোথায় অপসারণশক্তির আধিক্যবশতঃ পরমাণুরাশি ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইয়া প্রলয় উপস্থিত করিতেছে; কোথায়ও বা আকর্ষণশক্তির আতিশয্যনিবন্ধন পরমাণুরাশি ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। এই অনন্ত নভোমণ্ডলে যে অসংখ্য নক্ষত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহারা এক একটী প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিষ্কসমূহে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। আকর্ষণশক্তির প্রভাবে এই সকলেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এবং আরও অনেকের প্রাদুর্ভাব হইবে। পক্ষান্তরে, অপসারণশক্তির প্রভাবে ক্রমে ক্রমে একএকটীর বিলয় হইতেছে এবং আরও অনেকের বিলয় হইবে।

এখন আমাদের আবাসভূত এই ব্রহ্মাণ্ড বা সৌরজগতের কিরূপে প্রাদুর্ভাব হইল, তাহার বিবরণ করা যাউক। আদৌ এই সৌরজগতের অন্তরালভাগ পরমাণুরাশিতে ব্যাপ্ত ছিল। আকর্ষণশক্তির প্রভাবে পরমাণুসকল কেন্দ্রাভিমুখে যেমন ক্রমশঃ চালিত হইতে লাগিল, তেমনি অপসারণ-শক্তি দ্বারা তৎসমস্ত কেন্দ্র হইতে বিদূরিত হইতে লাগিল। সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে, গণিতের নিয়মানুসারে এই দুই বিরুদ্ধগতি নিরন্তর প্রতিহত হইয়া চক্রাকার ভ্রমণরূপে পরিণত হইবে। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আকর্ষণশক্তি অপেক্ষা অপসারণশক্তির প্রভাব অল্প হইতেছিল। সুতরাং পরমাণুপুঞ্জ ঘুরিতে ঘুরিতে কেন্দ্রের দিকেই অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া ঘনীভাব ধারণ করিতে লাগিল। পরমাণু-রাশি, এই প্রকার চক্রাকার গতি ও ঘনীভাবপ্রযুক্ত, একটী প্রকাণ্ড অঙ্গুরীয়ের আকার প্রাপ্ত হইল। এই প্রকাণ্ড অঙ্গুরীয়ের সকল স্থানে সমান বেগ ও সমান দার্ঢ্য সম্ভবে না। সুতরাং যে যে স্থানে বেগ অধিক ও দার্ঢ্য কম; তথা হইতে এক এক খণ্ড বিশ্লিষ্ট হইয়া দূরে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইহা নিশ্চিত যে, এই সকল বিক্ষিপ্ত খণ্ড,

গণিতের নিয়ম অনুসারে, সেই অঙ্গুরীয়ের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকিবে এবং ইহাও সম্ভব যে, সেই সকল বিক্ষিপ্ত পরমাণুরাশি হইতে আবার পূর্ব্বোক্ত কারণে এক বা ততোধিক খণ্ড পৃথক্‌ভূত হইয়া, তাহাদের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকিবে। এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সৌরজগৎ এইরূপ একটী প্রকাণ্ড অঙ্গুরীয়; সূর্য্য এই সৌরজগতের কেন্দ্রস্বরূপ; ইহা হইতে বিক্ষিপ্ত খণ্ড সকল এক একটী গ্রহ; এবং সেই সকল প্রাথমিক বিক্ষিপ্ত খণ্ড হইতে নিষ্কাশিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি উপগ্রহরূপে গ্রহগণের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

পদার্থবিদ্যার এই সাধারণ নিয়মযে, বস্তু সকল যত ঘনীভূত হয়, তাহা হইতে ততই তাপনির্গম হয়। যেমন বাষ্প হইতে জল, জল হইতে বরফ ইত্যাদি। সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি যত ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই উহা হইতে তাপ নিষ্কাশিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। আমাদের আবাসভূম এই পৃথিবী প্রথমে বাষ্পময়ী ছিলেন, পরে ক্রমশঃ তাপহীনা হইয়া জলময়ী হইলেন। সন্ধ্যার মার্জনে যে প্রথমে সমুদ্রের উদ্ভব কথিত আছে; মনুতে যে জলের প্রথম সৃষ্টি কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং পুরাণে যে জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার বর্ণিত আছে, তাহা কল্পনাবিজৃম্ভিত সন্দেহ নাই। কারণ, তাদৃশ প্রাচীন কালে উপরিউক্ত সাধারণ নিয়ম পরিজ্ঞাত থাকিবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। তথাপি ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে যে, প্রাচীন ভারতের কল্পনা বিজ্ঞানের এতদূর কাছাকাছি উঠিতে পারিয়াছিল।

ভূমণ্ডল যখন কেবল জলময়, তখনও ইহাতে এত তাপ ছিল যে, কোনমতে জন্তুর বাসযোগ্য হইতে পারে নাই। উত্তরোত্তর তাপের অপগম হওয়াতে, পৃথিবীর উপরিভাগস্থ জল ঘনীভূত হইয়া কঠিন আবরণরূপে পরিণত হইল। কিন্তু উহা প্রথমতঃ এত পাতলা ছিল যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত জলতরঙ্গের প্রতিঘাতে নিরন্তর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। তাহাতেই পৃথিবীর উপরিভাগ বিষম ও বন্ধুর হইতে লাগিল। সেই কঠিন আবরণ যেমন শীতল হইতে লাগিল, অমনি উপরিস্থিত বায়ুর অন্তর্গত বাষ্পসকল, জলাকারে পরিণত হইয়া, তাহার উপর বৃষ্টিরূপে পতিত হইতে লাগিল। সেই জল ছোট বড় গর্ত্তে জমা হইল। এইরূপে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত, উৎস, নদী, হ্রদ

সাগর, দ্বীপ প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। ভূমণ্ডলের উপরিস্থ আবরণ ক্রমে আরও শীতল এবং আরও স্থূল হওয়াতে, তাহাতে মহাদ্বীপ, মহাসাগর, বড় বড় হ্রদ, পর্ব্বত, নদী প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। অধুনা সেই কঠিন আবরণের বেধ কতিপয় মাইল পরিমিত হইবে; তথাপি পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তপ্ত জলরাশির বিলোড়নে সময়ে সময়ে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর সকল স্থান সূর্য্যের কিরণে সমানরূপে উত্তপ্ত হয়না, তাহাতেই ঋতু ও সংস্থান অনুসারে দেশভেদে আবহাওয়ার তারতম্য দেখা যায়। ভূমণ্ডলে প্রথমে উদ্ভিদের উদ্ভব হইয়াছিল। সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপেই তাহাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। উদ্ভিজ্জগণ নির্জীব হইলে, আবার সেই সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ নিবন্ধন শুকাইয়া, পচিয়া এবং মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা খনিজ পাদার্থে পরিণত হয়। জন্তুর মধ্যে মৎস্য পৃথিবীর প্রথম অধিবাসী; তাহার পর সরীসৃপ, তাহার পর পশু পক্ষী, সর্ব্বশেষে মনুষ্য উদ্ভূত হইয়াছে।

পঞ্চম মতটী অপেক্ষাকৃত সবিস্তরে বর্ণিত করিলাম। কিন্তু ইহার যথোচিত ব্যাখ্যা করিতে হইলে, বিজ্ঞান ও গণিত ঘটিত এত দুরূহ বিষয়ের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে যে, তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব। "বিজ্ঞানবাদ" নামে এই মতটীর নামকরণ করা যাইতে পারে। এই বিজ্ঞানবাদ মূল অংশে সাঙ্খ্য দর্শনের সহিত মিলে, বেদান্ত ও চার্ব্বাক দর্শনের সহিতও ইহার কতক ঐক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু ইহার অধিকাংশ, বিশেষতঃ ইহার প্রমাণ-পরীক্ষাভাগ, সম্পূর্ণ নূতন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একমাত্র ফল। ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ গণিতবেত্তা লাপ্লাস ইহার স্থাপনকর্ত্তা; ইংলণ্ডের বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী হারবার্ট স্পেনসার ইহার মণ্ডন ও পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানবাদ সাঙ্খ্যদর্শনের ন্যায় জগতের কোন নিমিত্তকারণ স্বীকার করেন না; আকর্ষণ-শক্তিসম্পন্ন পরমাণুরাশি হইতে ইহার স্বতই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এরূপ কল্পনা করেন। নৈয়ায়িকের মতে পঞ্চমহাভূতের পাঁচ প্রকার স্বতন্ত্র পরমাণু; সাঙ্খ্যের মতেও পঞ্চবিধ পৃথক্ তন্মাত্র পঞ্চমহাভূতের নিদান। কিন্তু বৈদান্তিকেরা বলেন যে, আকাশ বিকৃত হইয়া তেজ; তেজ বিকৃত হইয়া জল; জল আবার বিকৃত হইয়া মৃত্তিকা রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অতএব মূল ধরিতে

গেলে পরমাণু একপ্রকার। বিজ্ঞানবাদ অনুসারেও একপ্রকার পরমাণু হইতে সমগ্র বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে। অপিচ, বিজ্ঞানবাদ চার্ব্বাকদর্শনের ন্যায় মহাভূতকেই চেতন ও জড়ের উপাদান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সাঙ্খ্য প্রভৃতি দর্শনের ন্যায় চেতনরূপী আত্মাকে পঞ্চমহাভূত হইতে এক স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না।

এখন প্রস্তাবের দ্বিতীয় প্রকরণটার অবতারণ করা যাউক। মন্বাদি সংহিতা ও পুরাণের মতে প্রলয় দুই প্রকার:—খণ্ডপ্রলয় ও মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ে পরমাত্মাতে সমস্ত বিশ্ব বিলীন হয়, তাহার পর আর সৃষ্টিক্রিয়া হয় না। পরব্রহ্ম জাগ্রৎ ও নিদ্রিত অবস্থাশূন্য হইয়া কেবল একাকী বিরাজমান থাকেন। কিন্তু খণ্ডপ্রলয়ে সমুদায় বিনষ্ট হয় না, কেবল ত্রিলোকের বিলয় হয় মাত্র। যখন পরমাত্মা নিদ্রিত থাকেন, তখন সমস্ত জগৎ চেষ্টাশূন্য হইয়া প্রলয় উপস্থিত করে। আর যখন তিনি জাগরিত হন, তখন ভূতগণ ক্রিয়াসুক্ত হইয়া সংসারের ব্যাপারপরম্পরায় প্রবৃত্ত হয়। কত সহস্র সহস্র খণ্ডপ্রলয়ে এক মহাপ্রলয় হয়, তাহার অবধারণ নাই। সৃষ্টি ও খণ্ডপ্রলয়ের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু, তাহাতেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। এতৎসম্বন্ধে মনুর কয়েকটী শ্লোক অনুবাদ করিয়া দিব। তাহা হইলে পাঠক মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মত অবগত হইতে পারিবেন।

"মনুষ্যলোকের একবৎসরে দেবলোকের এক অহোরাত্র হয়। উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিন এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। চারি সহস্র বৎসরে সত্যযুগ; সত্যযুগের সন্ধ্যা চারিশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও* চারিশত বৎসর।"

"অন্যান্য যুগ এবং তদীয় সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ উত্তরোত্তর এক এক শূন্য; ত্রেতা তিন সহস্র বৎসর; তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ তিন শত বৎসর। তদ্রূপ দ্বাপর দুই সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা দুই শত বৎসর ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসর। সেই প্রকার কলি এক সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা এক শত বৎসর ও সন্ধ্যাংশ এক শত বৎসর। এই যুগচতুষ্টয়ের দ্বাদশ সহস্র সংখ্যাতে দেবতাদের একটী যুগ হয়।"

* সন্ধ্যা শব্দে প্রারম্ভকাল ও সন্ধ্যাংশ শব্দে উপসংহারকাল

"দেবলোকের সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন, এবং তত পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রি হয়"।

উপরি উক্ত অর্থ যথাশ্রুত স্বাভাবিক ও ভাষার নিয়মানুযায়ী; ইহাতে কোন কষ্টকল্পনা নাই। তদনুসারে সত্যযুগের পরিমাণ ৪৮০০ বৎসর, ত্রেতার ৩৬০০, দ্বাপরের ২৪০০ এবং কলির পরিমাণ ১২০০ বৎসর। কিন্তু মনুর প্রধান টীকাকার কুল্লূক ভট্ট, পুরাণের সহিত বিরোধ হয় এই ভয়ে, মনুর "বর্ষ" শব্দকে দৈব বর্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যা কোন মতে মনুর অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ মনুসংহিতায় উক্ত প্রকরণ মধ্যে দেবতাদের বর্ষ সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গ কিছুই উল্লিখিত হয় নাই, প্রত্যুত বর্ষশব্দ যে ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে মনুষ্যলোকেরই বর্ষ বুঝাইতেছে। সকল অতিশয়োক্তিতে পরিপূর্ণ। চারি যুগের পরিমাণ সমুদায়ে কেবল বার হাজার বৎসর হইলে, নিতান্ত অল্প দেখায়, এই ভাবিয়া পুরাণপ্রণেতারা বর্ষশব্দের অপ্রাসঙ্গিক অর্থ কল্পনা করিয়া, অনেক গুলি শূন্য বাড়াইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, পুরাণকর্ত্তাদের ও কুল্লূক ভট্টের মতে সত্যযুগ ১৭২৮০০০, ত্রেতা ১২৯৬০০০, দ্বাপর ৮৬৪০০০ এবং কলি ৪৩২০০০ বৎসর। পরন্তু মেধাতিথির মতে আরও বাড়াবাড়ি। তিনি বলেন যে, উক্ত গণনা অনুসারে যে যুগচতুষ্টয় হয়, তদ্রূপ সহস্র দৈবযুগ অর্থাৎ ৫১৮৪০০,০০০০,০০০, বৎসর কাল এই জগৎ বিদ্যমান থাকিবার পর খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হয়। সেই প্রলয়াবস্থা আবার তত সংখ্যক বৎসর বর্ত্তমান থাকিলে, পুনর্ব্বার নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হয়।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রলয়ের বর্ণনাতে কোন আড়ম্বর নাই। কেবল এই মাত্র উল্লিখিত আছে যে, পরব্রহ্মের জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থাতেই সৃষ্টি ও প্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু পৌরাণিক বর্ণনাতে বিস্তর আড়ম্বর ও অলঙ্কার দৃষ্ট হয়। পুরাণে এরূপ বর্ণিত আছে যে, প্রলয়কালে দ্বাদশ সূর্য্য যুগপৎ উদিত হইয়া সর্ব্বদাহকর জ্যোতি উদ্গীর্ণ করিবে, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু এককালে প্রবাহিত হইয়া ঘোরতর নির্ঘাত ও ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত করিবে, এবং পুষ্করাবর্ত্ত প্রভৃতি মেঘগণ মুষলের ধারে বৃষ্টি করিয়া বিশ্বমণ্ডল প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। ইত্যাদি যে সমস্ত বর্ণন আছে, তাহাতে দর্শনের গাম্ভীর্য্য

নাই, বিজ্ঞানের প্রমাণপরীক্ষা নাই এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের ঋজুতা নাই; কেবল কাব্যের প্রৌঢ়োক্তি মাত্র আছে।

অধুনা বিজ্ঞানবাদের মত বিবৃত হইতেছে। তদনুসারেও মহাপ্রলয় এবং খণ্ডপ্রলয় ভেদে প্রলয় দুই প্রকার। খণ্ডপ্রলয় কেবল আমাদের আবাসভূত এই সৌরজগৎ সম্বন্ধে, কিন্তু মহাপ্রলয়ে এই অনন্ত নভোমণ্ডলের অন্তর্গত অসংখ্য সৌরজগৎ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া, আদিম পরমাণুরাশিরূপে পরিণত হইয়া সমন্ততঃ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। যেমন এই জগন্মণ্ডল কোটি কোটি যুগে আদিম বাষ্পরাশি হইতে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি আরও কোটি কোটি যুগে ইহার চরম প্রাদুর্ভাব বা উন্নতি সংঘটিত হইবে এবং আরও কোটি কোটি যুগে উহার ক্ষয় ও বিলয় সমাহিত হইবে। এই অপরিসীম সৃষ্টিকালের ও প্রলয়কালের ইয়ত্তা করা মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য; এতদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলেও অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব জড়তা ও বৈধুর্য্যভাব উপস্থিত হয়। আমরা এতৎসম্বন্ধে যথার্থই বলিতে পারি, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

একটী লোষ্ট্র জোরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যত উঠিতে থাকে, তাহার বেগ তত কমিতে থাকে, পরে কতক দূর উঠিয়া ক্ষণকালের জন্য স্থির হয়। অনন্তর ক্রমশঃ বর্দ্ধমানবেগে নামিতে থাকে; অবশেষে ভূমিতে পতিত হইয়া সম্পূর্ণ স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। নিক্ষেপের বেগ ও পৃথিবীর আকর্ষণ এতদুভয়ের তারতম্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই উক্ত ঘটনার কারণ। আবার দেখ, প্রশান্ত সরসীজলে একটী সফরী মৎস্য ঘাই দিল। অমনি তরঙ্গমালা চক্রাকারে সমন্ততঃ প্রসারিত হইতে লাগিল। তরঙ্গ যত ফেলাও হয় ততই ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। পরিশেষে জলের তীরস্থ বস্তুর প্রতিঘাতে ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন সরসীর জল আবার পূর্ব্ববৎ প্রশান্ত ভাব ধারণ করে।

নিস্তব্ধ নিশীথসময়ে বীণা হইতে একটী মধুর ঝঙ্কার উঠিল, সুরলহরী গগণপথে ভাসমান হইল। তাহার অনুরণনধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া বায়ুসাগরে বিলীন হইল; আর কিছুই শুনা গেল না। পুনর্ব্বার স্বর নিস্তব্ধ হইল। বায়ুর প্রতিঘাতই ইহার কারণ। অতএব আমরা দেখিতেছি, যে স্থলে বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয় ব্যাপৃত থাকে, তথায় নানা ক্রিয়ার পর চরমে শান্তি সংঘটিত হয়। আমরা

এই সংসারবৃত্তান্ত যতই পর্য্যবেক্ষণ করিব, ততই দেখিতে পাইব যে, সকল ঘটনাই বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের ফল। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি আমাদের দেহকে নীচের দিকে নিরন্তর টানিতেছে, কিন্তু মাংসপেশীর সমুদিত শক্তি তাহাকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। আবার আত্যন্তিক পরিশ্রম বা পীড়া নিবন্ধন মাংসপেশী শিথিল হইলে, বিশ্রাম ও শয়নের প্রয়োজন হয়। মৃত্যুসময় সেই শক্তির নির্ব্বাণকাল, তখন করচরণাদির চালন পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে নিশ্বাস, প্রশ্বাস, ও শরীরের আভ্যন্তরীণ বিবিধ রাসায়নিকক্রিয়া নিবন্ধন নিরন্তর জীবনী শক্তির হ্রাস হইতেছে। খাদ্যগ্রহণ, বায়ুসেবন প্রভৃতিদ্বারা তাহার প্রতিবিধান না হইলে শরীররক্ষা হয় না। বাল্যকালে ক্ষয় অপেক্ষা বৃদ্ধি অধিক; সুতরাং অধিকতর পরিমাণে পুষ্টিসাধন হয়। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত এইপ্রকারে শরীরের বৃদ্ধি; পরে ক্ষয়ের আরম্ভ হয়। সেই ক্ষয়ের চরম সীমাই মৃত্যু এবং মৃত্যুই বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের বিরামাবস্থা।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আকর্ষণশক্তির ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ-শক্তির ক্রমশঃ হ্রাস প্রযুক্ত এই সৌর জগতের উপাদানভূত পরমাণু সকল উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইতেছে। সেই ঘনীভাবনিবন্ধন সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতির আয়তন ও পরিমাণ অবশ্যই ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে এবং উহারা পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইতেছে। এঙ্কির ধূমকেতু পূর্ব্বে যে সময়ে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিত, এখন তাহার কিছু লাঘব দেখিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে যে, কালে গ্রহ উপগ্রহগণ সূর্য্যের সন্নিহিত হইতে হইতে পরিশেষে উহাতে পতিত ও বিলীন হইয়া যাইবে। কিন্তু সে কালের কে ইয়ত্তা করিতে পারে? অধ্যাপক হেমহল্‌ট্‌ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সূর্য্যমণ্ডলে এখন যত তাপ আছে, সৃষ্টির আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহার চারিশত পঁয়তাল্লিশ গুণ তাপ এই সৌর জগতের উপাদানভূত পরমাণুরাশি হইতে উদ্গীর্ণ হইয়াছে। পরন্তু এখন প্রতিবৎসর যে পরিমাণে তাপ-নিঃসরণ হইতেছে, আর দশ লক্ষ বৎসর সেই রূপ তাপ প্রদান করিলে সূর্য্য-মণ্ডলের ব্যাস বিংশতিভাগের এক ভাগ কমিয়া যাইবে। অর্থাৎ তাপাপগম-নিবন্ধন ঘনীভূত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল আয়তনে তত পরিমাণে ছোট হইয়া পড়িবে। এইরূপে কয়েক কোটি বৎসরে সূর্য্য এত ঘনীভূত হইতে পারে যে, উহা

হইতে আর পর্য্যাপ্তপরিমাণে তাপনির্গম হইবে না। কিন্তু তৃণ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই জীবন সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপের উপর নির্ভর করিতেছে; অতএব ইহাও সম্ভব যে, পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডলে নিপতিত হইবার পূর্ব্বে জীবযুক্ত থাকিবে না। উক্ত ঘটনার অনেক পূর্ব্ব হইতে পার্থিব জীবনের ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকিবে। যেমন জীবমণ্ডলীর উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সহস্র সহস্র যুগে অসংখ্য ভৌতিক পরিবর্ত্তনে ঘটিয়াছে, তেমনি তৎসমস্তের ক্ষয়ও অকস্মাৎ সংঘটিত না হইয়া অল্পে অল্পে বহুকালে সাধিত হইবে। পৃথিবীর এখনও বাল্যাবস্থা বলিলে চলে; এপর্য্যন্ত উন্নতির কয়েকটি সোপান মাত্র রচিত হইয়াছে বলিলে চলে। লঙ্কেশ্বর রাবণ মর্ত্তালোক হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত একটী সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। উন্নতি সেই স্বর্গস্পর্শী সিঁড়ির ন্যায় অসীম; ইহার চরমসীমায় পৌছিতে কত যুগ যুগান্তর লাগিবে, তাহার গণনা হয় না। তাহার পর সাম্যাবস্থা; সেও বহুকালব্যাপিনী। পরিশেষে ক্ষয়াবস্থা, তাহাও অপরিসীম। অতএব মনুষ্যজীবনের সহিত তুলনা করিলে, প্রলয়কাণ্ড যে কত দূরে অবস্থিত তাহার ইয়ত্তা হয় না। তাহার নিকট অনুমানও হার মানেন, কেবল ভারতীয় শাস্ত্রকারদিগের কল্পনাই কাছাকাছি যাইতে উদ্যম করেন। যাহা হউক প্রলয়ের আশঙ্কা কেবল দুই একজন বাতুলেরই চিত্তবিভ্রম জন্মাইতে পারে। আমাদের মত স্থূলদৃষ্টি লোকের সংসারকার্য্যে কোন বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না।

তথাপি সকল প্রকার দৃষ্টান্ত ও তর্ক প্রলয় ঘটনার অনুকূলেই যুক্তি দিতেছে। অধ্যাপক হেম্‌হল্‌ট গণনা করিয়া বলিয়াছেন, যদি পৃথিবীর গতি অধুনা অকস্মাৎ কোন অলৌকিক আঘাত পাইয়া বন্ধ হইয়া পড়ে; তাহা হইলে তাহা হইতে যে তাপ উদ্ভূত হইবে, তৎসম্বন্ধে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, পাতুরে কয়লার জালে এইরূপ চৌদ্দটী পৃথিবী যুগপৎ প্রজ্বলিত হইলে, যত তাপনিঃসরণ হয়, উহা তত্তুল্য হইবে। অনেক বাদ দিয়া ধরিলেও সেই তাপপরিমাণ ১১২০০ ডিগ্রি হইবার সম্ভাবনা। পৃথিবীর গতি বন্ধ হইলে উহা অবশ্যই ভয়ানক বেগে সূর্য্যমণ্ডলে গিয়া পতিত হইবে। সেই নির্ঘাতে আবার পৃথিবীর পূর্ব্বোক্ত উত্তাপ চারিশত গুণ অধিক হইয়া উঠিবে। এইরূপে সকল

গ্রহ উপগ্রহ যখন সূর্য্যমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন যেরূপ উত্তাপের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে সমগ্র সৌরজগৎ সূক্ষ্ম পরমাণুরাশিতে পরিণত হইয়া দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিবে। তখন, সৃষ্টির পূর্ব্বে যে প্রকার ছিল, আবার সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবে। ইহাকেই আমরা বিজ্ঞানবাদোক্ত খণ্ড-প্রলয় নামে নির্দ্দেশ করিতেছি।

তামসী নিশায় উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই যে, নভোমণ্ডলের সকল স্থানে নক্ষত্রগণ সমান ঘনভাবে গ্রথিত নহে। কোথায় সাতটী, কোথায় বা পাঁচটী, কোন কোন স্থানে বা দুই দুইটী তারকা সম্মিলিত হইয়া জ্বলিতেছে। যাহাকে ছায়াপথ বলে, এবং যাহা পৌরাণিক কল্পনাতে স্বর্গনদী "মন্দাকিনীরূপে" বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্তবকাকার তারকাবলী ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন কথা হইতেছে, নক্ষত্রমণ্ডলের যে ঘনভাব ও বিরলভাব, তাহা স্বাভাবিক, না কোন প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন? অনেক পর্য্যবেক্ষণ ও গণনাদ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, নক্ষত্রগণ স্থির নহে; উহাদের গতি আছে এবং সে গতি মাধ্যাকর্ষণশক্তির নিয়মাধীন। আমাদের সূর্য্যমণ্ডলের গতি অবধারিত হইয়াছে, উহার পরিমাণ প্রতি ঘণ্টায় পাঁচলক্ষ মাইল। সর্ জন হর্শেল বলেন, সূর্য্য অপরাপর নক্ষত্রের সহিত একদিকেই ভ্রমণ করিতেছে, তদনুসারে সূর্য্যের বাস্তবিক গতি উক্ত দৃশ্যমান গতি অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক হইবে সন্দেহ নাই। অতএব, প্রত্যেক নক্ষত্র যদি সূর্য্যের ন্যায় গতিবিশিষ্ট এবং একএকটী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্বরূপ হয়; তাহা হইলে তাহারা আকর্ষণশক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইতেছে, এরূপ অনুমান অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। দূরবীক্ষণদ্বারা গগনমণ্ডলে যে সকল তারাযুগল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা যে কেবল দেখিতে যুগল এমন নয়; বস্তুত যুগলই বটে। অর্থাৎ তাহারা সন্নিকৃষ্টভাবে, ভীষণ বেগে পরস্পরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা কালে যে আরও সন্নিকৃষ্ট হইতে থাকিবে এবং পরিণামে যে পরস্পরের উপর পতিত হইবে, তাহা অনুমান করা অযৌক্তিক নহে।

পৃথিবীর ন্যায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর গ্রহ অপেক্ষাকৃত অল্পতর বেগে সূর্য্যে পতিত হইলে, কিরূপ ঘটনা উপস্থিত হইবে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন

মনে করিয়া দেখ, দুইটী তারা দুই সূর্য্যের ন্যায় প্রকাণ্ড পিণ্ডদ্বয়; অসীম দূর হইতে পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইয়া ভয়ানক বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা যখন পরস্পর সংঘর্ষিত হইবে, তখন আরও তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইবে। তখন দুই তারকামণ্ডল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুরাশিতে পরিণত হইয়া, নভোমণ্ডলের একদেশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিবে। অধুনা অনুধাবন করিয়া দেখ, এরূপ ঘটনার পরিণাম কি হইবে! যে সকল তারকামণ্ডল অবশিষ্ট রহিল, তাহারা যখন এই পরমাণুব্যাপ্ত আকাশপ্রদেশের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিবে, তখন, তাহারা নিরন্তর পরমাণুপুঞ্জের প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। অতএব, তাহাদের সংঘর্ষণ, স্বভাবতঃ যত সময়ে ঘটিতে পারে, উক্ত প্রতিঘাতবশতঃ তদপেক্ষা আরও সত্বর ঘটিতে থাকিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটীর পর আর একটী তারকাযুগল পরমাণুরাশিতে পর্য্যবসিত হইবে। নভোমণ্ডলের যত অধিক ভাগ পরমাণুতে পরিপূর্ণ হইবে, অবশিষ্ট তারকামণ্ডল সকল তত অল্পতরসময়ে বিলয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। এইরূপে এই পরিদৃশ্যমান নক্ষত্রমণ্ডল ক্রমশঃ সন্নিকৃষ্ট ও পরমাণুরাশিতে পরিণত, হইয়া কোটি কোটি যুগে, সহস্র সহস্র খণ্ডপ্রলয়ের পর, মহাপ্রলয়কাণ্ড সংঘটিত করিবে। তখন আবার সমস্তই পরমাণুপূর্ণ ও অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, উক্তপ্রকার মহাপ্রলয়ে জগতের মহানিদ্রা হইল কিনা? এতদুত্তরে যুক্তি ও কল্পনা এই কথা বলিবেন যে, মহাপ্রলয়কাণ্ডে বর্ত্তমান অখিলব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস হইল বটে; কিন্তু তাহার পর সৃষ্টিক্রিয়া যে আর হইবে না, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। যেমন প্রথম সৃষ্টিকালে পরমাণুরাশির আকর্ষণশক্তির আতিশয্য ও সম্প্রসারণশক্তির ন্যূনতা নিবন্ধন ক্রমে বিশ্বসংসারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; আবার তাদৃশ অবস্থা সংঘটিত না হইবার কারণ কি? মহাপ্রলয়কালে সম্প্রসারণশক্তির চরম আধিক্য ও প্রাবল্য হয়। কালে যে আবার সেই সম্প্রসারণশক্তির খর্ব্বতা ও আকর্ষণশক্তির প্রবলতা হইবে না এবং তন্নিবন্ধন পুনর্ব্বার পরমাণুরাশি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতা ও ঘনীভাব ধারণ করিবে না, তাহাতেই বা প্রমাণ কি আছে? যাহা হউক এ বিষয়ে আর আন্দোলন করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা বিজ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য, তাহাতে মৌনাবলম্বন করাই সঙ্গত।

দশকুমার।

পূর্ব্বপীঠিকা।

মগধদেশে পুষ্পপুরী নামে এক মহানগরী ছিল। তথায় রাজহংস নামে এক চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষীর নাম বসুমতী। রাজা রাজহংসের শিতবর্ম্মা ধর্ম্মপাল ও পদ্মোদ্ভব নামে তিন প্রাচীন পৈতৃক মন্ত্রী ছিলেন। শিতবর্ম্মার সুমতি ও সত্যবর্ম্মা নামে দুই সন্তান। ধর্ম্মপালের সুমিত্র সুমন্ত্র ও কামপাল নামে তিন সন্তান। পদ্মোদ্ভবের সুশ্রুত ও রত্নোদ্ভব নামে দুই সন্তান। সত্যবর্ম্মা সংসার অসার ভাবিয়া তীর্থযাত্রা-ভিলাষে দেশান্তর-প্রস্থান করেন। কামপাল সাতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন; তিনি পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের অবাধ্য হইয়া নানাদেশভ্রমণে নির্গত হন। রত্নোদ্ভব বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। সুমতি সুমিত্র সুমন্ত্র ও সুশ্রুত এই চারি জন, রাজা রাজহংসের মন্ত্রিত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

একদা মগধরাজ, মালবদেশের ভূপতি মানসারের অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য সসৈন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন; এবং ঘোরতর সংগ্রামে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া, পুনর্ব্বার অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে আপন পদেই প্রতিষ্ঠিত রাখিলেন। অনন্তর স্বদেশে আসিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। রাজার অধিক বয়ঃক্রম হইল, কিন্তু সন্তান হইল না; তাহাতে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সন্তানকামনায়, ভূতভাবন ভগবান্ নারায়ণের আরাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। কিছুকাল বিলম্বে তাঁহার মহিষী বসুমতী গর্ভবতী হইলেন। মগধরাজ রাজহংস দেশ-বিদেশীয় আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, মহাসমারোহপূর্ব্বক পরমাহ্লাদে বসুমতীর সীমন্তোন্নয়ন করিলেন।

এক দিন রাজা মন্ত্রিগণসমভিব্যাহারে সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার এক চর মালবদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ দিল, মহারাজ, মালবেশ্বর মানসার, মহারাজের নিকট পরাজিত হইয়া, সাতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তিনি বৈরনির্যাতনমানসে মহাকালনিবাসী মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া এক বীর-ঘাতিনী গদা পাইয়াছেন। এক্ষণে মহারাজের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন, যাহা বিধেয় হয়, করুন। দূতমুখে অমাত্যেরা দেব-দত্ত-গদা-প্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া ভীত হইলেন, মগধরাজকে দুর্গ-আশ্রয়ের পরামর্শ দিলেন, এবং তন্নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মগধরাজ তাঁহাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই মালবরাজ সসৈন্য আসিয়া মগধদেশে প্রবেশ করিলেন।

তৎকালে মন্ত্রিগণ সাতিশয় ব্যগ্রতাসহকারে রাজহংসের অনুমতি লইয়া, বিন্ধ্যাটবীমধ্যে শত্রুদিগের অগম্য এক সুরম্য স্থান নির্ণয় করিলেন, এবং মগধরাজের ও আপনাদিগের পরিবারগণকে তথায় প্রেরণ করিলেন, আর, তাহাদের রক্ষার্থ কতকগুলি লোক নিযুক্ত রাখিলেন। এদিকে মালবরাজের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে মালবরাজ শিবদত্ত গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই অব্যর্থ গদা সারথিকে বিনাশ করিয়া, রথস্থ মগধরাজকে বিচেতন ও মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিল। তখন রথযোজিত অশ্বগণ মুক্তরশ্মি হইয়া, দৈবগত্যা সেই বিন্ধ্যাটবীর পথেই রথ লইয়া ধাবমান হইল। মালবনাথ এইপ্রকারে জয় প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত মগধরাজ্য অধিকার করিলেন।

তখন রাজহংসের অমাত্যগণ প্রভুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনরূপেই তাঁহার উদ্দেশ পাইলেন না। অবশেষে বিন্ধ্যাটবীমধ্যে রাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী বসুমতী রাজার অনুদ্দেশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রগাঢ় শোকে অভিভূত ও উন্মত্তপ্রায় হইলেন, এবং অবিলম্বেই প্রাণপরিত্যাগে স্থির নিশ্চয় করিলেন। মন্ত্রিগণ বলিলেন, রাজ্ঞি! মহারাজ এখনও জীবিত থাকিলেও থাকিতে পারেন, বিশেষতঃ দৈবজ্ঞমুখে শুনিয়াছি আপনার গর্ভে সর্ব্বশত্রুবিনাশন সর্ব্বভূমির অধীশ্বর সন্তান

রহিয়াছেন। মন্ত্রিগণের প্রবোধবচনে বসুমতী তৎকালে কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। কিন্তু অবিলম্বেই তাঁহার শোকানল প্রবলরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন আর ক্ষণমাত্রও জীবনরক্ষায় সমর্থ না হইয়া, উদ্বন্ধমরণ অবধারণ করিলেন। নিশীথসময়ে সকলকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া নিঃশব্দ-পদে বাটী হইতে বাহির হইলেন। এবং বিন্ধ্যাটবীর প্রান্তভাগে গিয়া উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা এক বটবৃক্ষের শাখায় উদ্বন্ধনের উদ্যোগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হে নাথ! জন্মান্তরেও যেন আমি তোমাকেই স্বামী পাই।"

রাজহংসের অশ্বগণ, অরণ্যপথে রথের গতি রোধ হওয়াতে, ঘটনাক্রমে সেই বটবৃক্ষের নিকটেই দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছিল। তৎকালে রজনীর হিমানীসম্পর্কে রাজার মূর্চ্ছাভঙ্গ হওয়াতে, স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। শুনিয়াই স্বরপরিচয়ে মহিষী বসুমতীকে চিনিতে পারিয়া সত্বর তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। বসুমতী অকস্মাৎ এইরূপ অচিন্তনীয় আহ্বান-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন মগধনাথ রহিয়াছেন। তখন স্বামীর সন্দর্শনে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইল। পরে বিন্ধ্যাটবীভবনে অমাত্যগণের নিকট উভয়ে উপস্থিত হইয়া তত্তাবৎ বৃত্তান্ত বলিলেন।

রাজা রাজহংস এইরূপে জীবনলাভ করিয়া বিন্ধ্যাটবী-মধ্যবর্ত্তী গোপন-ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয় নিমিত্ত তাঁহার অন্তঃকরণ সদা দ্বেষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। একদা তদ্বনবাসী কালত্রয়দর্শী বামদেব মহর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সমক্ষে আপন মনোদুঃখ নিবেদন করিয়া বলিলেন, মহাশয়, আমি মানসারকে কিরূপে পরাজয় করিব তাহার কোন উপায় বলিয়া দিউন। বামদেব বলিলেন, মহারাজ, কিছু দিন সহ্য করিয়া থাক, বসুমতীর গর্ভে সকলরিপুমর্দ্দন রাজনন্দন অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহা হইতেই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। তৎকালে ঐরূপ দৈববাণীও হইল। রাজা মুনিবচনে ও দৈববচনে নির্ভর করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে মহিষী বসুমতী শুভক্ষণে সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত সন্তান প্রসব করিলেন। ভূপতি যথাবিধানে সন্তানের জাতকর্ম্মাদি করিয়া রাজবাহন নাম

রাখিলেন। তৎকালে সুমতি, সুমিত্র, সুমন্ত্র, সুশ্রুত, এই চারি মন্ত্রীরও প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, বিশ্রুত নামে চারি পুত্র জন্মিল। রাজবাহন সেই মিত্রচতুষ্টয়ের সহিত বাল্যলীলাসুখে দিন দিন বর্দ্ধমান হইতে লাগিলেন।

একদা এক তাপস, রাজলক্ষণাক্রান্ত এক কুমারকে আনিয়া রাজহংসের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, মহারাজ, কুশ সমিধ্ আহরণার্থ আমি এক বনে গমন করিয়াছিলাম, দেখিলাম এক নারী রোদন করিতেছে, জিজ্ঞাসিলাম কি নিমিত্ত তুমি এই জনশূন্য অরণ্যে একাকিনী রোদন করিতেছ। সে বলিল, মহাশয়, আমার প্রভু মিথিলারাজ প্রহারবর্ম্মা, নিজ বন্ধু মগধরাজের সীমন্তিনীর সীমন্তোন্নয়ন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সপরিবারে পুষ্পপুরে আসিয়াছিলেন। তৎকালে মালবেশ্বর মানসার মগধরাজ্যে আসিয়া রাজহংসের সহিত ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করেন; তাহাতে মগধেশ্বর পরাজিত হইলেন। আমার প্রভু তখন কি করেন, প্রাণে প্রাণে পরিজনগণের সহিত আপন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। স্বদেশে আসিয়া দেখিলেন, ভ্রাতৃপুত্র বিকটবর্ম্মা অন্যায় করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়াছে। সে কোনরূপেই তাঁহাকে তথায় প্রবেশ করিতে দিল না। তিনি অসহায়, কি করেন, ভাগিনেয় সুহ্মরাজে আশ্রয়গ্রহণার্থ সুহ্মরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। অরণ্যপথে যাইতেছেন, হঠাৎ কতকগুলা শবরসৈন্য আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহাতে সাতিশয় ভীত হইয়া, কে কোথায় পলায়ন করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। আমি এবং আমার কন্যা দুজনে, রাজার দুটী যমজ সন্তানের ধাত্রী ছিলাম। দুটী সন্তান লইয়া এই অরণ্যমধ্যে পলায়ন করিতেছি, হঠাৎ এক ব্যাঘ্র আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়া ভূমিপৃষ্ঠপতিত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলাম। তথায় ব্যাধগণ একটা ফাঁদ পাতিয়া তন্মধ্যে এক মৃত গাভী রাখিয়াছিল, সন্তানটী আমার হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সেই গাভীর ক্রোড়মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ব্যাঘ্র কালপ্রেরিত হইয়াই যেন আমাকে ছাড়িয়া সেই গাভীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এমন সময় ফাঁদ হইতে এক বাণ বিনির্গত হইয়া ব্যাঘ্রের প্রাণ বিনাশ করিল। পরে দেখিলাম, শবরেরা আসিয়া মৃত ব্যাঘ্র ও জীবিত

বালক লইয়া প্রস্থান করিল। আমার কন্যা যে কোথায় গেল, কিছুই জানি না। সেইজন্য এই রোদন করিতেছি।

মহারাজ, এই কথা বলিয়া সে আপন প্রভুর অনুগামিনী হইবার মানসে প্রস্থান করিল। আমি তখন মহারাজের মিত্র মিথিলারাজের বিপদ শ্রবণে দুঃখিত হইয়া, তাঁহার সন্তানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, দেখিলাম অরণ্যস্থিত চণ্ডিকা-দেবীর সম্মুখে একটী কুমার, রহিয়াছে। শবরেরা তাহাকে বলিদান দিবার মানস করিয়াছে। আমি শবরগণকে বলিলাম, অহে ব্যাধগণ, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার একটী শিশু হারাইয়াছে, তোমরা কি দেখিয়াছ?। তাহারা আমার প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক সেই বালককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, যদি এইটী তোমার শিশু হয় লইয়া যাও। আমি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বালকটী লইয়া এই আসিতেছি, মহারাজকে উপহার দিলাম।

রাজা বন্ধুর বিপত্তির কথা শুনিয়া কাতর হইলেন, এবং উপহার প্রাপ্ত হওয়াতে, বালকের উপহারবর্ম্মা নাম রাখিয়া রাজবাহনের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন।

রাজহংস একদা তীর্থস্নানার্থ অরণ্যপথে যাইতেছিলেন, এক শবরীর ক্রোড়ে পরম সুন্দর রাজলক্ষণাক্রান্ত একটী সন্তান দেখিতে পাইলেন; জিজ্ঞাসিলেন, অবলে, এই রাজকুমারকে তুমি কোথায় পাইলে? সে বলিল, রাজন্, অরণ্যপথে শবরসৈন্যেরা একদা মিথিলারাজের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিল। সেই সময়ে আমার স্বামী এই শিশুটী হরণ করিয়া আনিয়াছেন। রাজহংস সেই শিশুকে মিত্র মিথিলারাজের পুত্র বিবেচনা করিয়া শবরীকে ধনদানপূর্ব্বক শিশুটী আনিলেন, এবং শবরের অপহৃত বলিয়া অপহারবর্ম্মা নাম দিয়া তাহাকে দেবীহস্তে প্রতিপালনার্থ সমর্পণ করিলেন।

একদা বামদেবের এক শিষ্য, রাজার সম্মুখে একটী বালক আনিয়া, বলিলেন, রাজন্, আমি রামতীর্থে স্নান করিতে গিয়াছিলাম। প্রত্যাগমনকালে দেখিলাম, বনমধ্যে এক বৃদ্ধা এই কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া আকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছে। জিজ্ঞাসিলাম, বৃদ্ধে, তুমি কে? এই শিশুটীই বা কে, কিজন্য অরণ্যে একাকিনী আসিয়াছ? বৃদ্ধা বলিল, মহাশয়,

কালযবন দ্বীপে কালগুপ্ত নামে এক বণিক্ আছেন। মগধরাজ্যের রাজমন্ত্রীর পুত্র রত্নোদ্ভব বাণিজ্যার্থ ঐ দ্বীপে উপনীত হইয়া কালগুপ্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। কালক্রমে তিনি গর্ভবতী হইলেন। পরে রত্নোদ্ভব শ্বশুরের অনুমতি লইয়া সস্ত্রীক স্বদেশে যাত্রা করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সমুদ্রে যান ভগ্ন হইয়া নিমগ্ন হইল। আমি সেই কন্যার ধাত্রী। সেই গর্ভিণীকে হস্তে ধরিয়া এক কাষ্ঠফলক অবলম্বন করিয়া এই তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছি। রত্নোদ্ভব জলমগ্নই হইলেন, কি কোথাও উত্তীর্ণ হইলেন, কিছুই জানি না। তাঁহার পত্নী একে পূর্ণগর্ভা, তাহে আবার বারিপ্রবাহে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিলেন; তাহাতে প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। বন মধ্যেই এই পুত্রটী প্রসব করিয়া অবিলম্বেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আমি কি করি, শিশুটী লইয়া লোকালয়ের পথ অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি। ইহার জননী বিচেতনা সেই স্থানেই পতিত রহিয়াছে।

মহারাজ, বৃদ্ধা এই কথা কহিতেছে, এমন সময় এক বন্য হস্তী তথায় উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা যেমন ভীত হইয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিবে, অমনি তাহার ক্রোড় হইতে শিশুটী পতিত হইল। আমি তখন এক বৃক্ষের অন্তরালে ছিলাম। হস্তী শুণ্ড দ্বারা সেই শিশুকে উত্তোলন করিবামাত্র, হঠাৎ এক সিংহ আসিয়া হস্তীকে বিনাশপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। বালকটী হস্তীর শুণ্ড হইতে ভূতলে পতিত হইবামাত্র, তত্রত্য তরু হইতে এক বানর অবরোহণ করিল, এবং পক্কফলভ্রমে ইহাকে লইয়া বৃক্ষে আরোহণ করিল; কিন্তু ইহা ফল নয় দেখিয়া ফেলিয়া দিল। তখন আমি দেখিলাম, এই বালক এত সাজ্যাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও জীবিত রহিয়াছে। সুতরাং ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া ইহার জননী ও ধাত্রীকে অনেক অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। পরে গুরুর আশ্রমে আনয়ন করিলাম। তিনি মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

রাজা রাজহংস এককালে সকল মিত্রেরই বিপদঘটনায় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর পুষ্পতুল্য সুন্দর বলিয়া ঐ শিশুর নাম পুষ্পোদ্ভব রাখিলেন, এবং পালনার্থ তাহার পিতৃব্য সুশ্রুতের হস্তে অর্পণ করিলেন।

এক দিন মহিষী বসুমতী একটী কুমার ক্রোড়ে করিয়া রাজার নিকট আসিয়া কহিলেন, স্বামিন্, গত যামিনী এক দিব্য কামিনী এই শিশুটী লইয়া আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বিনয়বচনে বলিলেন, "দেবি, আমি মাণিভদ্র যক্ষের কন্যা, আমার নাম তারাবলী, আমি তোমার মন্ত্রিনন্দন কামপালের প্রেয়সী। তোমার পুত্র রাজবাহন সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইবেন, তাঁহার পরিচর্য্যার্থ আমার এই পুত্র অর্থপালকে যক্ষরাজের অনুমতিক্রমে আনিয়াছি; তুমি ইহাকে প্রতিপালন কর।" স্বামিন্, আমি এই কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম, এবং সেই যক্ষকন্যাকে সমুচিত সমাদর করিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। রাজা রাজহংস, কামপালের যক্ষকন্যাপরিণয়-সংবাদে বিস্মিত হইলেন, এবং সুমিত্রকে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র অর্থপালকে অর্পণ করিলেন।

পরদিবস বামদেবের শিষ্য সোমশর্ম্মা একটী অতি সুকুমার কুমার আনয়ন করিয়া ভূপালকে বলিলেন, মহারাজ, আমি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে কাবেরী-তীরে গিয়াছিলাম, দেখিলাম, এই বালকটী ক্রোড়ে লইয়া এক বৃদ্ধা রোদন করিতেছে। জিজ্ঞাসিলাম, বৃদ্ধে, তুমি কে, এই বালকটীই বা কে, কিনিমিত্ত এই অরণ্যে আসিয়াছ? বৃদ্ধা আমাকে আপন শোক-শল্যের উদ্ধার-ক্ষম বিবেচনা করিয়া, কহিল, মহাশয়, মগধরাজ রাজহংসের মন্ত্রিপুত্র সত্যবর্ম্মা তীর্থযাত্রার উদ্দেশে এতদ্দেশে আসিয়া, এক ব্রাহ্মণের কালী নামে এক কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু কালীর গর্ভে সন্তান না হওয়াতে, সত্যবর্ম্মা তাহারি ভগিনী কাঞ্চনকান্তিকেও বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে এই সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে। কালী তাহাতে সাতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া এই বালককে এবং আমাকে ছলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া এই নদীতে নিক্ষেপ করিল। আমি ইহার ধাত্রী, ইহাকে এক হস্তে ধরিয়া এক হস্তে সাঁতার দিতে লাগিলাম। ভাগ্যক্রমে ঐ সময়ে নদীবেগে এক তরুশাখা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহা অবলম্বন করিয়া কোন প্রকারে তীরে উত্তীর্ণ হইলাম। কিন্তু সেই শাখাস্থিত কালসর্প আমাকে দংশন করিয়াছে। এক্ষণে বিষবেগে আমার প্রাণবিয়োগ হইলে কে এই বালককে পালন করিবে এই

ভাবিয়া শোকে রোদন করিতেছি। এই কথা বলিতে বলিতেই বৃদ্ধা বিচেতন হইয়া পড়িল। আমি অনেক যত্ন করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। সুতরাং বালকটী লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। রাজা, সোমশর্ম্মার দত্ত বলিয়া তাহার সোমদত্ত নাম দিয়া, তাহার পিতৃব্য সুমতির নিকট সমর্পণ করিলেন।

রাজবাহন, প্রমতি মিত্রগুপ্ত মন্ত্রগুপ্ত বিশ্রুত উপহারবর্ম্মা অপহারবর্ম্মা পুষ্পোদ্ভব অর্থপাল ও সোমদত্ত এই নয় কুমারের সহিত এইরূপে একত্র মিলিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। যথাযোগ্য কালে তাঁহাদের চূড়া উপনয়ন প্রভৃতি সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন হইল। রাজা রাজহংস তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষার্থ উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। শিশুগণ যথোচিত পরিশ্রমসহকারে কিয়ৎকালমধ্যে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া রাজা রাজহংসের আনন্দ বিধান করিলেন। তন্মধ্যে রাজবাহন সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন।

টেলিমেকস।

এ পর্য্যন্ত কালিপ্সো নিস্পন্দভাবে টেলিমেকসের বর্ণিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে ছিলেন; এক্ষণে কহিলেন, টেলিমেকস! তোমার বিস্তর পরিশ্রম হইয়াছে, এক্ষণে বিশ্রাম কর। এই দ্বীপে তোমার কোনও আশঙ্কা নাই; এখানে তুমি যে অভিলাষ করিবে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইবে; অতএব চিন্তা দূর কর, অন্তঃকরণে আনন্দের উদয় হইতে দাও, এবং দেবতারা তোমার নিমিত্ত যে অশেষবিধ সুখসম্ভোগের পথ প্রকাশ করিতেছেন, তদনুবর্ত্তী হও। কল্য যখন অরুণের আলোহিতকরস্পর্শে পূর্ব্বদিকের স্বর্ণময় কপাট উদ্ঘাটিত হইবে, এবং সূর্য্যের অশ্বগণ, সৌর কর দ্বারা নভোমণ্ডল হইতে নক্ষত্রগণকে নিষ্কাশিত করত, সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইতে থাকিবে, সেই সময়ে তুমি পুনরায় আত্মবৃত্তান্তবর্ণন আরম্ভ করিবে। জ্ঞানে, সাহসে ও বিক্রমে তুমি তোমার পিতাকে অতিক্রম করিয়াছ। একিলিস হেক্টরকে পরাজিত করেন; থিসিউস নরক হইতে প্রত্যাগমন করেন; মহাবীর হিরাক্লিস বসুন্ধরাকে বহুসংখ্যক দুর্দ্দান্ত দানবের হস্ত হইতে মুক্ত করেন; ইঁহারা কেহই শৌর্য্যে ও ধর্ম্মচর্য্যায় তোমার তুল্য হইতে পারেন নাই। আমি প্রার্থনা করিতেছি, যেন অবিচ্ছিন্ন সুখনিদ্রায় তোমার নিশাবসান হয়। কিন্তু হায়! ত্রিযামা আমার পক্ষে কি দীর্ঘযামা ও ক্লেশদায়িনী হইবে। পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিয়া তোমার অপূর্ব্ব স্বরমাধুরী শ্রবণ করিব, বর্ণিত বৃত্তান্ত পুনরায় বর্ণন করিতে কহিব, এবং যাহা এ পর্য্যন্ত বর্ণিত হয় নাই, তাহাও সবিস্তর শ্রবণ করিব বলিয়া যে, আমি কত উৎসুক রহিলাম, তাহা তোমাকে বলিয়া জানাইতে পারি না। অতএব প্রিয়সুহৃৎ টেলিমেকস! দেবতারা কৃপা করিয়া পুনরায় তোমায় যে মিত্ররত্ন মিলাইয়া দিয়াছেন তাঁহাকে লইয়া যাও; যে বাসগৃহ তোমাদের নিমিত্ত নিরূপিত হইয়াছে, তথায় গমন করিয়া বিশ্রামসুখে যামিনী যাপন কর।

এই বলিয়া দেবী টেলিমেকসকে নিরূপিত বাসগৃহে লইয়া গেলেন। ঐ গৃহ দেবীর আবাসগৃহ অপেক্ষা কোনও অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। উহার এক পার্শ্বে একটী প্রস্রবণ স্থাপিত ছিল, তদীয় ঝর্ঝরনিনাদশ্রবণমাত্র পরিশ্রান্ত জীবের নিদ্রাকর্ষণ হইত; অপর পার্শ্বে অতিকোমল পরমরমণীয় দুইটী শয্যা প্রস্তুত ছিল; একটী টেলিমেকসের, অপরটী তাঁহার সহচরের নিমিত্ত অভিপ্রেত।

দেবী গৃহ হইতে বহির্গতা হইলে, কেবল তাঁহারা দুই জনে তন্মধ্যে রহিলেন। মেণ্টর শয্যারূঢ় না হইয়া টেলিমেকসকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, আত্মবৃত্তান্ত-বর্ণনে তোমার যে সুখানুভব হয়, সেই সুখের বশবর্ত্তী হইয়াই তুমি বিপদ্গ্রস্ত হইলে। বুদ্ধিকৌশলে ও সাহসবলে যে সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়াছিলে, তাহা বর্ণন করিয়া তুমি কালিপ্সোর চিত্ত হরণ করিয়াছ। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া আমার আর এমন আশা নাই যে, তুমি কখনও এখান হইতে প্রতিগমন করিতে পারিবে। যে ব্যক্তিতে এরূপ চিত্তবিনোদনী শক্তি আছে তাহাকে যে তিনি সহজে ছাড়িয়া দিবেন, ইহা কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। আত্মগুণকীর্ত্তনের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি এই অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছ। তিনি তোমাকে তোমার পিতৃবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করাইবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত বিষয় গোপিত রাখিয়া অন্যান্য নানা গল্প করিয়া কাটাইতেছেন, আর তোমার নিকট তাঁহার যাহা জানিবার আবশ্যকতা আছে, কৌশল করিয়া জানিয়া লইতেছেন। চাটুকারিণী স্বৈরচারিণীদিগের এইরূপই স্বভাব ও ব্যবহার। টেলিমেকস! যখন তুমি আত্মশ্লাঘার দমন করিতে শিখিবে এবং কোন সময়ে কোন বিষয় গোপন করিলে বক্তার চাতুর্য্যপ্রকাশ হয় তাহা জানিবে, সে দিন কবে আসিবে বলিতে পারি না। তুমি তরুণবয়স্ক এই বিবেচনায় অনেকে তোমার দোষ দেখিলেও মার্জ্জনা করেন এবং বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি তোমার কোনও দোষেরই মার্জ্জনা করিতে পারি না। কেবল আমি তোমার অন্তঃকরণ জানি; সমক্ষে দোষ কহিতে পারে এরূপ মিত্র তোমার আর কেহই নাই। আহা! তোমার পিতা তোমা অপেক্ষা কত অধিক বুদ্ধিজীবী!

টেলিমেকস উত্তর করিলেন, কালিপ্সো যখন সাতিশয় উৎসুকচিত্তে আমার দুঃখের কথা শুনিতে চাহিলেন, তখন কিরূপে আমি প্রত্যাখ্যান করি, বল। মেণ্টর কহিলেন, না, প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার অবমাননা করিতে বলা আমার অভিপ্রেত নহে; কিন্তু যে সকল বিষয় বর্ণন করিলে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদয় হইতে পারিত, সেইরূপ বিষয়েরই বর্ণনা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল। এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইত যে,আমরা বহুকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে সিসিলি দ্বীপে কারারুদ্ধ হইয়াছিলাম এবং তৎপরে মিসর দেশে আমাদিগকে দাসত্ব পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। অতিরিক্ত যাহা কহিয়াছ, তদ্দ্বারা তদীয় হৃদয়স্থিত অসদভিলাষ তীব্রবীর্য্যবিষবৎ উদ্দাম ও অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি দেবতাদিগের নিকট নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেছি যেন তোমার হৃদয় তাদৃশ অসদভিলাষে দূষিত না হয়। টেলিমেকস কহিলেন, আমি যে সম্পূর্ণ অবিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার সন্দেহ নাই; এক্ষণে কি কর্ত্তব্য উপদেশ কর। মেণ্টর উত্তর করিলেন, প্রারব্ধ বৃত্তান্তের যথাবৎ উপসংহার না করিয়া আর এখন গোপন করা যাইতে পারে না। কালিপ্সোকে যেরূপ চতুরা দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহাকে এ বিষয়ে ভুলাইয়া রাখা সম্ভব নহে; বিশেষতঃ, সেরূপ চেষ্টা করিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন। অতএব, বিপদের সময় দেবতারা যে সমস্ত বিষয়ে তোমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কোনও অংশ গোপন না করিয়া সবিশেষ সমুদায় বর্ণন করিবে। কিন্তু যখন কোনও প্রশংসাযোগ্য স্বীয় কার্য্যের বর্ণন করিতে হইবে, সেই সময়ে আত্মশ্লাঘা পরিহারপূর্ব্বক সমধিক বিনয় সহকারে কহিবে। টেলিমেকস, আনন্দিত মনে কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক, পরমমিত্র মেণ্টরের এই হিতকর উপদেশবাক্য গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা উভয়েই অবিলম্বে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন।

প্রভাত হইবামাত্র মেণ্টর শুনিতে পাইলেন, নিকটবর্ত্তী কাননে কালিপ্সো স্বীয় পরিচারিকা অপ্সরাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। শ্রবণমাত্র তিনি টেলিমেকসকে জাগরিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! আর কত নিদ্রা যাইবে, গাত্রোত্থান কর; চল আমরা কালিপ্সোর নিকটে যাই। 'কিন্তু!

তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তুমি কদাচ তাঁহার বাক্যে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিবে না, তাঁহাকে তোমার চিত্তভূমিতে স্থান দিবে না, তাঁহার আপাতমধুর প্রশংসাবাক্যকে বিষতুল্য জ্ঞান করিয়া সদা সতর্ক থাকিবে। গত কল্য কালিপ্সো, তোমার পিতা পরম বিজ্ঞ উইলিসিস, অপ্রধৃষ্য মহাবীর একিলিস, জগদ্বিখ্যাত থিসিউস, স্বর্গবাসী হিরাক্লিশ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অপেক্ষাও তোমার অধিক প্রশংসা করিয়াছিলেন। টেলিমেকস! এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তুমি ঐ প্রশংসাবাদ নিতান্ত অলীক ও অসম্ভব বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলে, অথবা উহা যথার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছিলে? যাহারা অলীক-প্রশংসাবাদ-শ্রবণে প্রীত হয়, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। যাহারা সেরূপ প্রশংসা করে, প্রশংসাসময়কালে তাহারাই মনে মনে উপহাস করিয়া থাকে। মিথ্যা প্রশংসা করিয়া কালিপ্সো স্বয়ং অন্তরে হাস্য করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি তোমাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ ও অপদার্থ স্থির করিয়া, অলীক প্রশংসাবাদ দ্বারা প্রীত ও প্রতারিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং আমার বোধ হয়, ঐ চেষ্টায় একপ্রকার কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

এইরূপ কথোপকথনের পর, তাঁহারা কালিপ্সোর নিকট গমন করিলেন। টেলিমেকসও মেণ্টরের উপদেশবলে, স্বীয় পিতা ইউলিসিসের ন্যায়, আমার মায়াজাল অতিক্রম করিয়া যাইবে, এই ভাবিয়া কালিপ্সোর অন্তঃকরণে যে বিষম আশঙ্কা ও প্রগাঢ় উৎকণ্ঠার উদয় হইয়াছিল, তাহা গোপন করিবার নিমিত্ত, তিনি কৃত্রিমহর্ষপ্রদর্শনপূর্ব্বক, ঈষৎহাস্য-সহকারে, মৃদু মধুর সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়সুহৃৎ টেলি-মেকস! তোমার বৃত্তান্তের শেষভাগ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার চিত্তে যে অতিবিপুল কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়া আছে, তাহা হইতে আমাকে মুক্ত কর। আমি কল্য সুষুপ্তিসম্ভূত সুখ সম্ভোগ করিতে পাই নাই, সমস্ত রাত্রি কেবল তোমার ফিনীশিয়া হইতে সাইপ্রসদ্বীপযাত্রার বিষয় স্বপ্নে দেখিয়াছি; অতএব আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই; শীঘ্র সবিশেষ সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার অন্তঃকরণের আকুলতা নিরাকরণ কর। অনন্তর তাঁহারা, এক সন্নিহিত নিবিড় কাননের অভ্যন্তর ভাগে

প্রবেশ করিয়া, সুষমাসম্পন্ন অশেষবিধকুসুমসুশোভিত শাদ্বলপ্রদেশের উপরি উপবেশন করিলেন।

কালিপ্সো টেলিমেকসকে বারংবার স্নিগ্ধনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মেণ্টর তাঁহার প্রত্যেক দৃষ্টিপাত নিবিষ্টচিত্তে লক্ষিত করিতেছেন দেখিয়া, সাতিশয় বিরক্ত হইলেন। তাঁহার পরিচারিকা অপ্সরাগণ, সন্নিহিত ভূভাগে উপবিষ্ট হইয়া, অনিমিষনয়নে টেলিমেকসকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। টেলিমেকস, বিনীতস্বভাববশতঃ ঈষৎ লজ্জিত ও অধোদৃষ্টি হইয়া, স্বীয় মুখপদ্মের অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদনপূর্ব্বক আত্মবৃত্তান্তবর্ণন আরম্ভ করিলেন।

টেলিমেকস কহিলেন, দেবি! শ্রবণ করুন, অনুকূল বায়ুবশতঃ ফিনীশিয়া অবিলম্বেই আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। তদবধি আমি সাইপ্রিয়নদিগের সহচর হইলাম; কিন্তু তাহাদিগের রীতিচরিত্রাদির বিষয় কিছুমাত্র জানিতাম না, সুতরাং কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া একাকী এক পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলাম। এইরূপে কিঞ্চিৎক্ষণ উপবিষ্ট থাকিতে থাকিতে, নিদ্রাবেশবশে আমি বিচেতন হইলাম; আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তি এককালে স্থগিত হইয়া গেল; আমি অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতে লাগিলাম; আমার হৃদয়কন্দর আনন্দরসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ দেখিতে পাইলাম, বীনসদেবী কপোতবাহন রথে অধিরূঢ় হইয়া মেঘমালা ভেদ করিয়া, গগনমণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন এবং প্রচণ্ডবেগে অবতীর্ণ হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আমার সম্মুখে আগমন করিলেন। তাঁহার যৌবনবিলাস, মৃদু মধুর হাস্য ও অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা কি কহিব, তাদৃশ রূপনিধান কামিনীরত্ন ভূমণ্ডলে কখনও কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। তিনি আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, অহে গ্রীকযুবক! তুমি অবিলম্বেই আমার অধিকারে প্রবেশ করিবে এবং এক অশেষসুখাস্পদ পরম রমণীয় দ্বীপে উপনীত হইবে; তথায় তোমার সর্ব্বজনপ্রার্থনীয় অশেষবিধ সুখসম্ভোগের সম্পূর্ণ সুযোগ ঘটিবে; অতএব তুমি এই অবধি আপন অন্তঃকরণের অভিলাষানুরূপ সুখসম্ভোগের প্রণালী কল্পনা করিতে আরম্ভ কর। তুমি ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত জানিবে যে, আমি

সকল দেবীর প্রধানা ও সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরাক্রমশালিনী; অতএব আমি তোমার প্রতি সদয় হইয়া যে অভিলষিত সুখসম্ভোগের সুযোগ ঘটাইয়া দিতেছি, সাবধান! যেন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আমার অবমাননা, ও তদুপলক্ষে আমার কোপে পড়িয়া আত্মবিনাশসম্পাদন করিও না।

এই সময়ে আমি দেখিতে পাইলাম, কামদেব দুইটী পক্ষ বিস্তার করিয়া জননীর চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছেন। মধুরতা ও বাল্যকালোচিত ঋজুতা সেই প্রিয়দর্শনের সহাস্য বদনে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বল নয়নযুগলের অনির্ব্বচনীয় ভঙ্গী দর্শনে আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। তিনি আমার প্রতি অতি স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া যারপর নাই মনোহর ভাবে ঈষৎ হাস্য করিলেন বটে; কিন্তু উহা নির্দ্দয়তা, দুরাশয়তা, ও অবজ্ঞাসূচক উপহাসমাত্র বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় স্বর্ণময় তূণ হইতে এক অতি তীক্ষ্ণফল শর তুলিয়া লইলেন; অনন্তর ঐ শর শরাসনে সন্ধান করিয়া আমার উপর নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে মিনর্ব্বাদেবী সহসা আবির্ভূত হইয়া, স্বীয় অক্ষয় চর্ম্ম আমার সম্মুখে ধারণ করিলেন। আমি বীনসের আকারে যেরূপ কোমলতা ও বিলাসবিভ্রম নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, মিনর্ব্বা দেবীর আকারে তাহার কিছুমাত্র দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার রূপ অকৃত্রিম, অবিকৃত, ও সম্যক বিশুদ্ধ বোধ হইতে লাগিল, তাহাতে কপটতার লেশও লক্ষিত হইল না; দর্শনমাত্র তাঁহাকে ওজস্বিনী, প্রতাপবতী ও বিস্ময়োৎপাদিনী বলিয়া বোধ হইল। কন্দর্পশায়ক দেবীর ফলকে অভিহত ও তদ্বিদারণে অসমর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে কন্দর্প, লজ্জায় অধোবদন ও ক্রোধে স্ফুরিতাধর হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক চাপসংহার করিলেন। তখন মিনর্ব্বাদেবী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অরে নির্লজ্জ বালক! তুই এখান হইতে দূর হ; যে সকল নরাধম জ্ঞান, মান, লজ্জা ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া জঘন্য ইন্দ্রিয়সেবায় রত হয়, কেবল তাহাদিগের উপরই তোর প্রভুত্ব আছে। কন্দর্প, ভর্ৎসনাবাক্যশ্রবণে ক্রোধে নিতান্ত অধীর ও লজ্জায় একান্ত অবনতবদন হইয়া, কোনও উত্তর না দিয়াই আমার সম্মুখদেশ হইতে সহসা অপসৃত হইলেন; বীনসও

রথারোহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টিতে তাঁহার রথ লক্ষ্য করিয়া রহিলাম; পরিশেষে উহা জলদমণ্ডলে অন্তরিত হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, মিনর্ব্বাদেবীও অন্তর্হিতা হইয়াছেন।

তদনন্তর আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন এক পরম রমণীয় উপবনে নীত হইয়াছি। আমি পূর্ব্বে স্বর্গের যেরূপ বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছিলাম; ঐ উপবন-দর্শনে তাহা আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তথায় প্রিয়সুহৃৎ মেণ্টরের সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল। বন্ধু আমাকে কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি এই অশেষ দোষের অদ্বিতীয় আবাসভূমি সংঘাতক দ্বীপ হইতে অবিলম্বে পলায়ন কর; অধিক কি কহিব, এ স্থানের বায়ুও ইন্দ্রিয়সুখাসক্তিদোষে দূষিত; এখানে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যেরও ধর্ম্ম-ভ্রংশের আশঙ্কা আছে, পলায়ন ব্যতিরেকে পরিত্রাণের উপায় নাই। আমি মেণ্টরকে দেখিবামাত্র, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলাম; অনেক চেষ্টা পাইলাম, কিন্তু এক পাও চলিতে পারিলাম না; অনেক কষ্টে বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহার ছায়ামাত্র আলিঙ্গন করিলাম, কিন্তু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে আমার হৃদয় যাদৃশ অনির্ব্বচনীয় প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হয়, সে প্রীতিলাভ করিতে পারিলাম না। আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উৎসুক ও অস্থির হওয়াতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল; জাগরিত হইয়া বুঝিতে পারিলাম, দেবতারা স্বপ্নচ্ছলে আমাকে উপদেশ প্রদান করিলেন। তদবধি বিষয়বিতৃষ্ণা ও ধর্ম্মলোপশঙ্কা আমার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল এবং লম্পট ও ইন্দ্রিয়সুখপরতন্ত্র সাইপ্রিয়নদিগকে আমি ঘৃণা করিতে লাগিলাম; কিন্তু হয় ত মেণ্টর নরলীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গলোকে প্রস্থান করিয়াছেন; এই শঙ্কায় আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত কাতর-ভাবাপন্ন হইলাম।

আমি এইরূপে মেণ্টরের মৃত্যুসম্ভাবনা করিয়া অন্তঃকরণে অশেষপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম; আমার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে পোতবাহেরা আমার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি উত্তর করিলাম, যে হতভাগ্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসি-

য়াছে, কিন্তু যাহার হৃদয়ে প্রতিগমনের কোনও প্রত্যাশা নাই, তাহার রোদনের কারণ অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। সে যাহা হউক, পোতস্থিত সাইপ্রিয়নেরা অল্পক্ষণমধ্যেই আমোদ প্রমোদে এককালে মত্ত হইয়া উঠিল। পোতবাহদিগের স্বভাব এই যে, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে পাইলেই আপনাদিগকে পরম সুখী জ্ঞান করে; এক্ষণে বিশ্রামের অবকাশ পাইবামাত্র তাহারা ক্ষেপণীহস্ত হইয়াই নিদ্রা যাইতে লাগিল। কর্ণধার কর্ণ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় শরীর কুসুমে সুশোভিত করিল এবং পরক্ষণেই এক প্রকাণ্ড পানপাত্র হস্তে লইয়া তদ্গত সমুদায় সুরাই পান করিল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই সুরাপানে মত্ত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সকলে মিলিয়া বীনস ও কন্দর্পের প্রশংসাপূর্ণ এমন অশ্লীল গান করিতে আরম্ভ করিল যে, যে ব্যক্তির ধর্ম্মে শ্রদ্ধা আছে, সে ত্রস্ত ও বিস্ময়গ্রস্ত না হইয়া কখনও শ্রবণ করিতে পারে না।

এইরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া তাহারা আমোদ প্রমোদে মগ্ন রহিয়াছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ এক প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া সাগরবারি আলোড়িত করিতে লাগিল; চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অতি প্রচণ্ড বেগে বায়ু বহিতে লাগিল; অর্ণবযান, উভয় পার্শ্বে তরঙ্গাহত হইয়া, ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিল। এই সময়ে আমাদের পোত এক জলমধ্যবর্ত্তী অতি প্রকাণ্ড পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে ভাসিতে লাগিল। আমরা বোধ করিতে লাগিলাম, উহা ঐ পর্ব্বতে অভিহত হইয়া অবিলম্বেই চূর্ণীকৃত হইবে; সুতরাং প্রতিক্ষণেই মৃত্যুপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সম্মুখভাগে আরও কতকগুলি শৈল লক্ষিত হইতে লাগিল; দেখিলাম, সাগরবারি ভীষণগর্জ্জনপূর্ব্বক তদুপরি আস্ফালন করিতেছে।

আমি মেণ্টরের মুখে অনেকবার শুনিয়াছিলাম যে, সুকুমার ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকেরা কখনও সাহসিক হয় না, এক্ষণে সেই বাক্যের যথার্থতা প্রত্যক্ষ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সাইপ্রিয়নেরা সুরাপানে মত্ত হইয়া বিলক্ষণ আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, এক্ষণে তাহারা বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, হিতাহিতবিবেকবিমূঢ় হইয়া, জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক নারীদিগের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। তখন কেবল চীৎকার ও আর্ত্তনাদ

আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। কেহ এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, হায়! কেন এরূপ সুখসম্ভোগের বিঘ্ন ঘটিয়া উঠিল। কেহ বা ইহা বলিয়া মানসিক করিতে লাগিল, হে দেবগণ! যদি আমরা তোমাদের কৃপায় নিরাপদে তীরে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তবে তোমাদিগকে প্রচুর পূজা ও বলি প্রদান করিব। কিন্তু কেহই মগ্নপ্রায় প্রবহণের রক্ষাবিষয়ে যত্নবান হইল না। এরূপ অবস্থায়, সহচরদিগের ও নিজের প্রাণরক্ষা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, আমি স্বহস্তে কর্ণ ধারণ করিলাম, পোতবাহদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলাম, এবং অবিলম্বে নৌকার পালি খুলিয়া লইতে কহিলাম। পোতবাহেরা বিলক্ষণ বলপূর্ব্বক ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল-মধ্যে আমরা সেই সংঘাতক স্থান অতিক্রম করিলাম।

এই ঘটনা পোতবাহদিগের স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ হইতে লাগিল। তাহারা আমাকে জীবনদাতা জ্ঞান করিয়া, বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইয়া, অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আমরা মধুমাসে সাইপ্রস দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলাম। তথায় ঐ রমণীয় মাস কেবল বীনস দেবীর উপাসনায় নিয়োজিত হইয়া থাকে। সাইপ্রসবাসীরা কহে যে, ঐ সময়ে সমস্ত জগৎ পুনর্জীবিত হইয়া প্রফুল্ল ও মুদিত হইতে থাকে; এবং কুসুমরাশি অশেষ সুখ-সম্ভোগসামগ্রী সমভিব্যাহারে করিয়া কাননমধ্যে আবির্ভূত হইয়া উঠে; অতএব ঐ মাসই বীনস দেবীর উপাসনার প্রকৃত সময়।

তীরে উত্তীর্ণ হইবা মাত্র, আমি তত্রত্য বায়ুর অনির্ব্বচনীয় মার্দব অনুভব করিতে লাগিলাম, তদীয় স্পর্শে শরীর আলস্যে ও জড়তায় অভিভূত হইল, কিন্তু অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও উল্লাস আবির্ভূত হইতে লাগিল; বোধ হয়, এই জন্যই সাইপ্রসবাসীরা এরূপ অলস ও আমোদপ্রিয়। ফলতঃ, তত্রত্য লোকেরা স্বভাবতঃ এত পরিশ্রমকাতর যে, যদিও সে দেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, তথাপি প্রায় সমুদায় প্রদেশেই ক্ষেত্র সকল শস্যসম্পর্কশূন্য ও কর্ষণাদিচিহ্নবিরহিত লক্ষিত হইতে লাগিল। কিয়ৎ দূর গমন করিয়া দেখিলাম, পুরবাসিনীগণ, আমোদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, মনোহর বেশ ভূষা সমাধান-পূর্ব্বক, রাজপথ রুদ্ধ করিয়া, বীনসের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে করিতে, তাঁহার অর্চ্চনার্থ তদীয় মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিতেছে। তাহারা পরম রূপবতী

বটে, কিন্তু কুলকামিনীদিগের শালীনতাপূর্ণ রূপ লাবণ্য অবলোকন করিলে অন্তঃকরণে যেরূপ নির্ম্মল প্রীতিরসের সঞ্চার হয়, তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া কোনও ক্রমেই সেরূপ হইল না। যে সকল লক্ষণ থাকিলে স্ত্রীলোকের রূপ লাবণ্যের মাধুরী ও মনোহরতা সম্পন্ন হয়, তাহাদের আকার প্রকারে তাহার একটীও লক্ষিত হইল না। এই সমস্ত অবলোকন করিয়া তাহাদের উপর আমার অত্যন্ত ঘৃণা ও দ্বেষ জন্মিল, এবং আমাকে প্রীত ও মোহিত করিবার নিমিত্ত তাহারা যে আয়াস ও যত্ন করিতে লাগিল, তাহাতে প্রীতিলাভ করা দূরে থাকুক, বরং আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলাম।

এই দ্বীপে বীনসের অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি তাহার অন্যতমে নীত হইলাম; দেখিলাম, উহা অতি মনোহর প্রস্তরে নির্ম্মিত ও সুঘটিত প্রকাণ্ড স্তম্ভসমূহে সুশোভিত। অসঙ্খ্য পূজার্থী বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া অনবরত তথায় আগমন করিতেছে। শোণিতপাত উৎসবের বিপরীত কার্য্য এই বিবেচনায়, অন্যান্য দেব দেবীর মন্দিরের ন্যায়, এখানে কখনও পশুবধ হয় না। দেবীর পূজার্থে কেহ কোনও পশু প্রদান করিলে, উহা পুষ্পমালাদিতে অলঙ্কৃত করিয়া দেবীর সম্মুখে নীত হয়; পরে মন্দিরের অনতি দূরে নির্দ্দিষ্ট স্থানবিশেষে পুরোহিতগণের ভোজনার্থ ব্যাপাদিত হইয়া থাকে। প্রদত্ত পশু শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক ও পূর্ণকায় না হইলে দেবীর গ্রহণযোগ্য হয় না।

সুস্বাদ সুবাসিত সুরাও পূজাকালে প্রদত্ত হইয়া থাকে। পুরোহিতেরা সুবর্ণমণ্ডিত শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করেন। মন্দিরমধ্যে সুগন্ধি ইন্ধন দ্বারা অহোরাত্র অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে এবং ধূমাবলী জলদাকারে উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। মন্দিরসংক্রান্ত যাবতীয় স্তম্ভ কুসুমমালায় সুশোভিত; সমস্ত পূজাপাত্র সুবর্ণনির্ম্মিত; সমুদায় অট্টালিকা সুগন্ধিলতামণ্ডপে পরিবেষ্টিত। বলিদানার্থ প্রদত্ত পশুর পুরোহিতসম্মুখে আনয়নে ও যজ্ঞীয় অগ্নির উদ্দীপনে, পরম সুন্দর কুমার ও কুমারী ব্যতিরেকে, আর কাহারও অধিকার নাই। দেবীর মন্দির যারপর নাই চমৎকারজনক বটে, কিন্তু উপাসকদিগের আচারদোষে উহার অযশ বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছে।

মন্দিরসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার অবলোকন করিয়া, প্রথমতঃ কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত আমার হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল; কিন্তু কিছুদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বদা ঐ সকল কাণ্ড নয়নগোচর করাতে, ক্রমে সে ভাবের তিরোভাব হইয়া গেল। তৎপরে পাপকর্ম্মদর্শনে আমার আর তাদৃশ ত্রাস হইত না; সংসর্গদোষে আমারও আচার ব্যবহার কলঙ্কিত হইতে লাগিল; পূর্ব্বে যে আমার পাপে অনাসক্তি, লজ্জাশীলতা, ও অপ্রগল্‌ভতা ছিল, তাহা সর্ব্ব সাধারণের উপহাসের আস্পদ হইয়া উঠিল। আমার ইন্দ্রিয়গণকে উদ্দীপিত, প্রলোভন দ্বারা আমাকে পাশবদ্ধ, ও আমার হৃদয়ে ভোগানুরাগ সঞ্চারিত করিবার নিমিত্ত সকলে নানাপ্রকার কৌশল করিতে লাগিল। আমি দিন দিন হতবুদ্ধি ও সদসদ্বিবেচনায় অসমর্থ হইতে লাগিলাম; বিদ্যাভ্যাসজনিত জ্ঞানপ্রভাব অন্তর্হিত হইল; ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্মকামনা এককালে লয় প্রাপ্ত হইল; চতুর্দ্দিক হইতে বিপৎসমূহ আমায় আক্রমণ করিতে লাগিল, তন্নিবারণে আমি নিতান্ত অক্ষম হইয়া উঠিলাম। প্রথমতঃ আমি পাপকে কালসর্প জ্ঞান করিয়া ভয়ে অভিভূত হইতাম, কিন্তু পরিশেষে ধর্ম্ম লইয়া লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম।

যেমন কোনও ব্যক্তি, গভীর ও বেগবতী নদীর সন্তরণে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমতঃ বিলক্ষণ শক্তিসহকারে অঙ্গসঞ্চালন করত স্রোতের প্রতিকূলে গমন করে, কিন্তু নদীর তট অত্যন্ত দুরারোহ হইলে, অবলম্বন না পাইয়া ক্রমে ক্রমে ক্লান্ত ও নিতান্ত হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে; শ্রমবাহুল্যবশতঃ তাহার সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া উঠে, এবং পরিশেষে তাহাকে নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া স্রোতের অনুবর্ত্তী হইতে হয়; আমারও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়া উঠিল। আমার চক্ষে পাপ আর বিরূপ বা কুৎসিত বোধ হইতে লাগিল না এবং আমার হৃদয় ধর্ম্মপালনপরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হইয়া উঠিল। জ্ঞানশক্তির সাহায্যগ্রহণে অথবা পিতৃদৃষ্টান্তের অনুসরণে আমি এককালে অক্ষম হইয়া উঠিলাম। পূর্ব্বে স্বপ্নাবস্থায় মেণ্টরকে স্বর্গলোকে দর্শন করিয়াছিলাম, সুতরাং, এক্ষণে আপনাকে নিতান্ত নির্ব্বান্ধব ও অসহায় স্থির করিয়া, ধর্ম্মপালনবিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া উঠিলাম। আপাতসুখকর অবসাদবিশেষ ক্রমে ক্রমে আমার শরীরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। আমি নিশ্চয় জানিতাম, উহা তীব্রবীর্য্য বিষ,

শিরা দ্বারা আমার সর্ব্বশরীরে প্রসৃত হইতেছে; কিন্তু তদ্দ্বারা তৎকালে বিলক্ষণ সুখানুভব করিতাম, এজন্য তৎপরিহারে যত্নবান হইতাম না। মধ্যে মধ্যে আমার চৈতন্য হইত, তত্তৎ সময়ে আমি আপন বন্দিভাব চিন্তা করিয়া সাতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতাম; কোনও সময়ে শোকাকুল হইয়া মনস্তাপ করিতাম; কখনও বা ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া প্রলাপবাক্য কহিতাম। আমি বলিতাম, যৌবনকাল জীবনের কি জঘন্য অংশ! দেবতারা এরূপ নির্দ্দয় বটে যে, মনিবগণকে বিপন্ন করিয়া কৌতুক দেখিতে থাকেন; কিন্তু তাঁহারা কেন এরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, যে দশায় পদে পদে বিপদ, বুদ্ধিভ্রংশ ও বিষয়বাসনানিবন্ধন দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা নিতান্ত অপরিহার্য্য; মানবমাত্রকেই সেই দশা ভোগ করিতে হইবে? আমার মস্তকের কেশ কেন অদ্যাপি শুক্ল হয় নাই এবং কেনই বা আমার অন্তিমকাল উপস্থিত হয় না? আমি এক কালেই কেন পিতামহের বয়ঃ প্রাপ্ত হই নাই? সর্ব্বক্ষণ যেরূপ লজ্জাকর চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিতেছে, তদপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে বিলাপ করিলে, আমার মনস্তাপ কিঞ্চিৎ শান্ত হইত, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ বিষয়বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনরায় বিচেতন হইত ও লজ্জা পরিত্যাগ করিত। কিঞ্চিৎ পরেই পুনরায় আমার বোধোদয় হইত এবং মনস্তাপ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিত।

এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে চিত্তবিভ্রমে ও মনোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া, আমি ব্যাধবিদ্ধ মৃগের ন্যায় সতত কাননে ভ্রমণ করিতাম। বেগবাহুল্যবশতঃ বিদ্ধ মৃগ মুহূর্ত্ত মধ্যে অরণ্যান্তরে গমন করে বটে, কিন্তু কক্ষস্থিত তীক্ষ্ণ শর নিরন্তর তাহার অন্তর্দাহ করিতে থাকে; সেইরূপ আমারও কাননভ্রমণ দ্বারা মনোবেদনা শান্তি করিবার আয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইত।

এক দিবস আমি এইরূপে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে কিঞ্চিৎ দূরে কাননের এক নিবিড় প্রদেশে মেণ্টরের মত এক পুরুষ সহসা আমার নয়নগোচর হইলেন। কিন্তু তিনি কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইলে পর, তাঁহার বদনে এরূপ মালিন্য, কার্কশ্য ও শোকচিহ্ন লক্ষিত হইল যে, তাঁহাকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দের উদয় হইল না। আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, হে প্রিয়তম মিত্র! হে মদীয় আশার

অদ্বিতীয় অবলম্বন! তুমি অকস্মাৎ কোথা হইতে উপস্থিত হইলে? আমি কি যথার্থই তোমায় নয়নগোচর করিতেছি, না আমার ভ্রম হইতেছে, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। সহসা আমার এরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইবে কেন? যাহা হউক, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি মেণ্টর, না মেণ্টরের প্রেতপুরুষ, আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আসিয়াছ? তুমি কি অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছ, মানবলীলা সংবরণ করিয়া অমরলোকে গমন কর নাই? আমার কি এত সৌভাগ্য হইবে যে, পুনরায় আবশ্যক সময়ে তোমার উপদেশের সাহায্য পাইব? ইহা কহিতে কহিতে আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া, আমি দ্রুতবেগে তৎসমীপবর্ত্তী হইলাম। তিনি এক পাও না চলিয়া আমার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন; আমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম; আমার অন্তরাত্মাই জানেন, তদীয় স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া তৎকালে কি অসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তখন আমি আহ্লাদভরে অধৈর্য্য হইয়া চীৎকার করিয়া কহিলাম, না এ মেণ্টরের প্রেতপুরুষ নয়, আমি তাঁহাকেই ধরিয়াছি, এবং প্রাণাধিক পরম বন্ধুকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতেছি!

এইরূপ আকুল উক্তি দ্বারা অন্তঃকরণের কাতরতা প্রকাশপূর্ব্বক, আমি তদীয় গলদেশে মগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম, একটীও কথা কহিতে পারিলাম না। তিনিও এরূপ ভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক সস্নেহনয়নে আমায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তদ্দর্শনে স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, কারুণ্যরসে তাঁহার হৃদয়কন্দর উচ্ছলিত হইতেছে। কিয়ৎক্ষণের পর আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, তখন আমি কহিতে লাগিলাম, হা প্রিয়বন্ধো! তুমি আমার পরিত্যাগ করিয়া এতদিন কোথায় ছিলে, এবং এক্ষণেই বা আমার ভাগ্যবলে অকস্মাৎ কোথা হইতে উপস্থিত হইলে? তুমি সন্নিহিত ছিলে না বলিয়া আমার পদে পদে কত বিপদ ঘটিয়াছে, বলিতে পারি না; তোমা ব্যতিরেকে আমি পরিত্রাণের কি উপায় করিতে পারি? মেণ্টর আমার বাক্যে মনোযোগ না দিয়া মেঘগম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না, অবিলম্বে এই স্থান হইতে পলায়ন কর। এখানকার ফল বিষময়, বায়ু মারাত্মক; নিবাসীরা মূর্ত্তিমান মারীভয়, কেবল সাংঘাতিক-বিষ-সঞ্চারণের অভিপ্রায়েই আলাপ করে। এখানে

জঘন্য ইন্দ্রিয়সেবাভিলাষ, জীবগণের হৃদয়ক্ষেত্র দূষিত করিয়া, তথা হইতে ধর্ম্মকে একবারে উন্মূলিত করে। অতএব পলায়ন কর, কেন বিলম্ব করিতেছ? একবারও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিও না এবং এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও যেন এই জঘন্য স্থান তোমার মনে উদিত না হয়।

মেণ্টরের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই আমি দেখিতে লাগিলাম যেন প্রগাঢ় অন্ধকার আমার সম্মুখদেশ হইতে অন্তর্হিত হইল এবং নয়নযুগল সহসা আবির্ভূত অদ্ভুত জ্যোতিঃপ্রভাবে পুনরায় প্রাদ্যোতিত হইয়া উঠিল। আমার অন্তঃকরণ শান্তিরসসংস্কৃত অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। সেই বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত বিষয়বাসনাজনিত জঘন্য আনন্দের কোনও প্রকারেই তুলনা হইতে পারে না। এক অভূতপূর্ব্ব নির্ম্মল জ্ঞানানন্দ ক্রমে ক্রমে আমার হৃদয়কন্দর পরিপূর্ণ করিল, পরিশেষে উচ্ছলিত হইয়া বাষ্পবারিচ্ছলে নয়নদ্বার দিয়া বিনির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর আমি কহিতে লাগিলাম, ধর্ম্ম প্রসন্ন হইয়া যাঁহাদিগকে স্বীয় সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন, তাঁহারা কি সুখী! তাঁহাদের তাদৃশমূর্ত্তি সাক্ষাৎকার করিলে যে পরম পবিত্র সুখলাভ করিতে পারা যায়, আর কোনও উপায় দ্বারাই তাদৃশ নির্ম্মল সুখলাভের সম্ভাবনা নাই।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ বিতর্ক করিয়া আমি পুনরায় মেণ্টরের প্রতি মনো-নিবেশ করিলাম। তিনি কহিলেন, টেলিমেকস! আমি এক্ষণে চলিলাম, আর মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করিতে পারি না। আমি কহিলাম, তুমি কোথায় যাইবে বল, আমি তোমার অনুগামী হইব, আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইবার মানস করিও না; বরং তোমার সহচর হইয়া প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি আর আমি কোনও ক্রমে তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। এই বলিয়া আমি তাঁহাকে অবিলম্বে বাহুপাশে বদ্ধ করিলাম। তিনি কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি আমাকে রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বৃথা প্রয়াস পাইতেছ; মিটফিস আমাকে আরবদিগের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাহারা বাণিজ্যার্থ সিরিয়া দেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী ডেমাস্কস নগরে গমন করিয়াছিল; তথায় হেজলনামক এক ব্যক্তি গ্রীকদিগের আচার ব্যবহার ও দর্শনশাস্ত্র অবগত হইবার মানসে, গ্রীক দাস ক্রয় করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া, আমায় অধিক মূল্যে

ক্রয় করিলেন। তদনন্তর তিনি, আমার নিকট হইতে গ্রীকদিগের রাজ্য-শাসনপ্রণালী অবগত হইয়া, ক্রীট নগরে গমন ও মাইনসের নিয়মাবলী অধ্যয়ন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন এবং তদনুসারে অবিলম্বে পোতারোহণপূর্ব্বক তদুদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু প্রতিকূলবায়ুবলে আমরা এই দ্বীপে উপনীত হইয়াছি। হেজল অর্চনার্থ বীনসদেবীর মন্দিরে গমন করিয়াছেন, ঐ দেখ, তিনি এই দিকেই আসিতেছেন; আর অনুকূল বায়ুও বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং, আমাদিগকে অবিলম্বেই পোতে আরোহন করিতে হইবে; অতএব প্রশস্ত মনে বিদায় দাও, আর আমায় রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিও না। টেলিমেকস! যে ধর্ম্মভীরু ক্রীত দাস দেবতাদিগের ভয় রাখে, সে কোনও ক্রমেই প্রভুর অবাধ্য হইতে পারে না। দেবতারা এক্ষণে আমাকে পরাধীন করিয়াছেন; যদি পরাধীন না হইতাম, তাহা হইলে আমি কোনও ক্রমেই তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম না; অতএব আমি বিদায় লইলাম। প্রস্থানকালে এইমাত্র বলিয়া যাই যে; ইউলিসিসের দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি ও শোকাকুলা পেনেলপীর অবিরলবিগলিত নয়নজল যেন তোমার চিত্রক্ষেত্র হইতে অন্তরিত না হয়। আর ইহাও সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিও যে, দেবতারা ন্যায়পরায়ণ। ইহা কহিয়া, মেণ্টর কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে অবস্থানপূর্ব্বক, বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদবচনে কহিলেন, হে দয়াময় দেবগণ! আমি নিতান্ত নিঃসহায় টেলিমেকসকে এই অপরিজ্ঞাত অবান্ধব দেশে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, আপনাদিগের নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনা এই, আপনারা ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। আমি শুনিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইলাম এবং বাষ্পপূর্ণ নয়নে তাঁহার করে ধরিয়া অতি কাতর বচনে কহিলাম, বয়স্য! তুমি যত বল ও যত চেষ্টা কর, আমার প্রাণ থাকিতে তুমি আমারে আর ফেলিয়া যাইতে পারিবে না; তোমার প্রভুর হৃদয় কি একেবারেই কারুণ্যরসে বিবর্জ্জিত হইবে? তিনি কি তোমায় আমার ভুজবন্ধন হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া যাইবেন? হয় তাঁহাকে আমার প্রাণবধ করিতে হইবে, নয় আমাকে তোমার সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিতে হইবে। তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাকে অবিলম্বে এই স্থান হইতে পলায়ন করিতে উপদেশ দিয়াছ, এক্ষণে তোমার

সঙ্গে পলায়ন করিতে নিষেধ করিতেছ কেন? আমার জন্যে হেজলকে তোমার অনুরোধ করিবার আবশ্যকতা নাই, আমি স্বয়ং তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিব এবং অঞ্জলিবন্ধপূর্ব্বক বিনয়বাক্যে আত্মপ্রার্থনা নিবেদন করিব। আমার তরুণ বয়স ও এই ঘোর দুরবস্থা দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে অবশ্যই অনুকম্পার উদয় হইবে। জ্ঞানোপার্জ্জনে যাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ যে, তৎসাধনোদ্দেশে দূরদেশগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় কোনও ক্রমেই নিতান্ত নিষ্ঠুর হইতে পারে না। আমি তাঁহার চরণে ধরিব এবং যাবৎ তিনি আমায় তোমার অনুগমন করিতে অনুমতি না দিবেন, তাবৎ তাঁহাকে গমন করিতে দিব না। আমি তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিব; যদি তিনি অগ্রাহ্য করেন, প্রাণত্যাগ করিয়া এককালে সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হইব।

আমার বাক্য সমাপ্ত হইবামাত্র, হেজল মেণ্টরকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র, আমি নিতান্ত কাতরভাবে তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইলাম। হেজল, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে [illegible] পার্শ্ববর্ত্তী দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কে? তোমার [illegible] কি, বল। আমি কহিলাম, আপনকার নিকট আমার অন্য কোনও প্রার্থনা নাই, আমি কেবল প্রাণদান প্রার্থনা করিতেছি। আমার পরম মিত্র মেণ্টর আপনকার দাস, যদি আপনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রদান না করেন, আমি নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিব। যিনি স্বীয় অসাধারণ [illegible] জগদ্বিখ্যাত করিয়াছেন, যাঁহার বুদ্ধিবলে ট্রয় নগর নিপাতিত হইয়াছে, সেই মহাবীর ইউলিসিসের পুত্র এইরূপ দীন ভাবে আপনকার নিকট এক অতি সামান্য প্রার্থনা করিতেছে। আপনকার নিকট আমার অপর প্রার্থনা এই যে, আপনি কদাচ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আপনকার নিকট সম্মানলাভ প্রত্যাশায় আমি স্বীয় আভিজাত্যের গৌরব কীর্ত্তন করিলাম। আমার দুর্দ্দশা দর্শনে আপনকার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইবে, কেবল এই আশয়েই আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি। পিতা অনুদ্দিষ্ট হইয়াছেন, আমি এই ব্যক্তির সহিত তদীয় অন্বেষণে নির্গত হইয়া নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছি। ইনি আমাকে এরূপ স্নেহ করিয়া থাকেন যে, আমি ইঁহাকে পিতৃতুল্য

জ্ঞান করি। ফলতঃ, ইনি আমার পিতা, বন্ধু, ও সহায়। কিন্তু আমি এমনই হতভাগ্য যে, ইঁহাকেও হারাইয়াছি। ইনি এক্ষণে আপনকার দাস হইয়াছেন; ইঁহার সহবাস ব্যতিরেকে আমি কোনও ক্রমেই প্রাণধারণ করিতে পারিব না; অতএব আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া আমাকেও আপনার দাস করুন। যদি আপনি যথার্থ ন্যায়ানুরাগী হন এবং মাইনসের নিয়মাবলী অবগত হইবার নিমিত্ত জলপথের নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আপনি কখনও এই হতভাগ্য কাতর জনের প্রার্থনা উল্লঙ্ঘন করিবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার কত দূর পর্য্যন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছে; আমি এক পরাক্রান্ত নরপতির তনয়, নিরুপায় ও অনন্যগতি হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে দাসত্ব যাজ্ঞা করিতেছি। আমি সিসিলি দ্বীপে দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছিলাম; সেখানে বহুবিধ বিপদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সে সকল আমার দুঃখের উপক্রম মাত্র বোধ হইতেছে। আমি পূর্ব্বে দাসত্বের ভয়ে মৃত্যু প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে পাছে সেই দাসত্ব না ঘটে এই ভয়ে কম্পিত হইতেছি। হে দয়াময় দেবগণ! আমার প্রতি একবার কটাক্ষ নিক্ষেপ কর; এ ক্লেশকর দেহভার-বহনে আমি নিতান্ত অক্ষম হইয়াছি।

আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া হেজলের হৃদয় কারুণ্যরসে উচ্ছলিত হইল। তিনি আমাকে তাঁহার হস্তাবলম্বন প্রদান করিয়া ভূমি হইতে উত্থিত করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, তোমার পিতার বুদ্ধি, বিক্রম, ধর্ম্মপরতা ও প্রতিপত্তির বিষয়ে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি, মেণ্টর আমাকে সমুদায় অবগত করিয়াছেন; পূর্ব্বদিকস্থ সমস্ত দেশেই তাঁহার নাম বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। টেলিমেকস! তুমি আমার সঙ্গে চল, যাবৎ তুমি পিতার অনুসন্ধান না পাও, তাবৎ আমিই তোমার পিতা হইলাম। যদিও আমি তোমাকে ও তোমার পিতাকে না জানিতাম, তথাপি, মেণ্টরের সহিত আমার যেরূপ মিত্রতা জন্মিয়াছে, তদনুরোধেই তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতাম। আমি মেণ্টরকে দাসত্বভাবে ক্রয় করিয়াছিলাম যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তিনি আমার সহিত এক উন্নত সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছেন; আমি অকিঞ্চিৎকর অর্থ ব্যয় করিয়া অমূল্য মিত্ররত্ন লাভ করিয়াছি। আমি যে জ্ঞানলাভ করিবার নিমিত্ত

উৎসুক হইয়াছিলাম এবং আমার যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, তাহা আমি মেণ্টরের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব এই দণ্ডেই আমি তাঁহার দাসত্ব মোচন করিলাম। আর তোমাকেও আমার দাসত্ব করিতে হইবে না; তুমি আমাকে যথাযোগ্য সম্মান করিবে এই মাত্র আমার অভিলাষ।

হেজলের এই অমৃতাভিষিক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার অন্তঃকরণের তাদৃশ প্রবল উদ্বেগ মুহূর্ত্তমধ্যে অসীম আনন্দে পরিণত হইল। আমি দেখিলাম, সর্ব্বনাশ হইতে আমার রক্ষা হইল; হেজলের অনুগ্রহে স্বদেশগমনের প্রত্যাশা জন্মিল; যে ব্যক্তি কেবল সদ্গুণানুরাগী হইয়া আমাকে এতাদৃশ স্নেহ করেন, তাঁহার সহবাসে কালক্ষেপ করিব ইহা চিন্তা করিয়া আমি পরম পরিতোষ লাভ করিলাম; আর মেণ্টরের সহিত মিলন হইল ও বিয়োগের আর সম্ভাবনা নাই, দেখিয়া আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিতে লাগিলাম।

হেজল অবিলম্বে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, মেণ্টর ও আমি তাঁহার অনুগামী হইলাম। অনন্তর, সকলে পোতে আরোহণ করিলাম। নাবিকেরা ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিতে লাগিল; আমাদের পোত শীতল সমীরণের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা যেন সজীব হইয়া, সুখকর গতি অবলম্বনপূর্ব্বক চলিতে আরম্ভ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সাইপ্রস দ্বীপ দৃষ্টিবহির্ভূত হইল। হেজল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, টেলিমেকস! তুমি সাইপ্রস দ্বীপবাসীদিগের কিরূপ আচার ব্যবহার দেখিলে? সেখানে আমি যে সকল বিপদে পড়িয়াছিলাম ও ধর্ম্মভ্রংশের যে উপক্রম ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় তাঁহাকে কৌশলক্রমে সবিশেষ অবগত করিলাম। তিনি শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বীনস দেবি! তুমি ও তোমার তনয় যে অসাধারণ পরাক্রমশালী, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিল; আমি তোমার যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়াছি, কিন্তু তোমার রাজ্যমধ্যে ইন্দ্রিয়সেবার আতিশয্য ও তোমার উপাসকদিগের জঘন্য আচার দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে অশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তন্নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

যে সর্ব্বশক্তিমান আদিপুরুষ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন; যিনি অনন্ত ও অবিনশ্বর জ্ঞানস্বরূপ; যিনি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বজীবের অন্তরে অধিষ্ঠান করিতেছেন, অথচ সর্ব্বক্ষণ অখণ্ডভাবে সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন;

যেমন সূর্য্যদেব সমস্ত জগৎ আলোকময় করেন, সেইরূপ যে সর্ব্বপ্রধান সর্ব্ব-ব্যাপী সত্যস্বরূপ পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল করিয়া থাকেন; সেই সর্ব্বেশ্বরের বিষয়ে হেজল মেণ্টরের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানালোকে বর্জ্জিত থাকে, সে সর্ব্বাংশে জন্মান্ধসদৃশ; পৃথিবীর মেরুদেশ ক্রমাগত অর্দ্ধ বৎসর কাল যেরূপ প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, সে সেইরূপ অন্ধকারে হতদৃষ্টি হইয়া জীবনকাল অতিবাহিত করে; সে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করে, কিন্তু বাস্তবিক সে অতি নির্ব্বোধ; সে মনে ভাবে, সকল পদার্থই নিরীক্ষণ করিতেছি, কিন্তু কোনও পদার্থ না নিরীক্ষণ করিয়াই তাহাকে জীবনযাত্রা সমাপন করিতে হয়। যাহারা অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়সুখে একান্ত আসক্ত হয়, তাহাদের এই অবস্থা। বাস্তবিক যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বলিত হয় এবং যাহারা সেই জ্ঞানালোক প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া চলে, তদ্ব্যতিরিক্ত লোকেরা কোনও ক্রমেই মনুষ্যনামের যোগ্য নহে; সেই জ্ঞানালোকের সঞ্চার হইলেই আমাদের অন্তঃকরণে সৎপ্রবৃত্তির উদয় হয়, এবং অন্তঃকরণে অসৎপ্রবৃত্তির উদয় হইলে সেই জ্ঞানালোকের সহায়তায় তাহা নিরাকৃত হয়। সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর মহার্ণবস্বরূপ, আমরা ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বরূপে সেই মহার্ণব হইতে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছি এবং অবশেষে সেই মহার্ণবে বিলীন হইব।

আমি এই কথোপকথনের সম্যক মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয় যে অতি সূক্ষ্ম ও উন্নত ইহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলাম, এবং আমার অন্তঃকরণে সত্যজ্যোতিও কিঞ্চিৎ সঞ্চারিত হইল। অনন্তর তাঁহারা, দেবগণ, দেবানুগৃহীত বীরপুরুষগণ, সত্যযুগ, প্রলয়, বিস্মৃতিসরিৎ*, নরকে দুরাচারদিগের অনন্ত যন্ত্রণাভোগ, স্বর্গলোকে সাধুদিগের নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মল সুখসন্তানসম্ভোগ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, আমিও একান্ত উৎসুকচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা দেখিতে পাইলাম, জলজন্তুগণ ক্রীড়া করিতে করিতে আমাদিগের প্রবহণের অভিমুখে আগমন করিতেছে; উহাদের ক্রীড়া

* পূর্ব্বকালীন গ্রীকদিগের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, মৃত ব্যক্তির জীবাত্মা এক নদীতে মজ্জিত হয় এবং মজ্জিত হইবামাত্র পূর্ব্বজন্মের যাবতীয় ব্যাপার বিস্মৃত হইয়া যায়।

দ্বারা অর্ণববারি আন্দোলিত হইয়া অতি বৃহৎ তরঙ্গ বিস্তার করিতেছে। কিঞ্চিৎ পরেই বিচিত্ররথারূঢ়া জলদেবতা আবির্ভূতা হইলেন। ঐ রথ হিমশুভ্র অর্ণবতুরগগণে আকৃষ্ট; উহাদের নাসারন্ধ্র হইতে প্রভূত ধূমরাশি প্রবল বেগে বিনির্গত হইতেছে, নয়নদ্বয় অনবরত অগ্নি উদ্গার করিতেছে, বহুসংখ্যক অপ্সরা সন্তরণ করিতে করিতে রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছে। জলদেবতা এক হস্তে সুবর্ণদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, ঐ দণ্ড দ্বারা অতি প্রবল তরঙ্গমালার শাসন ও ঔদ্ধত্য নিবারণ করিতেছেন, অপর হস্ত দ্বারা স্বীয় শিশু সন্তান পালিমনকে ক্রোড়দেশে ধারণ করিয়া স্তন্যপান করাইতেছেন। অতি-বৃহৎকায় তিমি মকর প্রভৃতি বিবিধ জলজন্তু স্ব স্ব আবাসস্থান হইতে বিনির্গত হইয়া একান্ত উৎসুকভাবে জলদেবতাকে অবলোকন করিতে লাগিল।

শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্য্যদর্শন।

ডারুয়িনের মত।

বানর হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হয়, এই অদ্ভুত কথায় সকলেই উপহাস করেন এবং এই মতের প্রবর্ত্তয়িতা ডারুয়িন সাহেবকে উড়াইয়া দেন। কিন্তু কিরূপ যুক্তিপরম্পরাতে উক্ত মত সমর্থিত হইয়াছে, তাহা জানিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহারও ইচ্ছা জন্মে না। বস্তুতঃ সেই সকল যুক্তি সাধারণের বোধগম্য নহে। লোকের স্বভাবই এই যে, যাহা চিরন্তন সংস্কারের বিপরীত, তাহার অনুকূল তর্কে কর্ণপাত করে না অথবা তাহার তত্ত্বানুসন্ধানার্থ তৎপর হয় না। ডারুয়িন সাহেবের মত কেবল অশিক্ষিত দলের কেন, শিক্ষিত দলের নিকটও সাধারণতঃ অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহা খৃষ্টীয়, মহম্মদীয়, হিন্দু প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্মের বিরোধী; সুতরাং ইহার প্রতিপোষক প্রমাণাদি শ্রবণ করিলেও প্রত্যবায় আছে, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, অনেকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। সকল ধর্ম্মেই বলে, প্রথমে মানবের সৃষ্টি; তৎপরে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির সৃষ্টি হইয়াছে। মনুতে এরূপ কীর্ত্তিত আছে যে, উদ্ভিদের সৃষ্টি মনুষ্যের পরে হইয়াছিল। পরন্তু পুরাণের বর্ণনানুসারে পক্ষিসর্পাদি মনুষ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানের মত এইরূপ সৃষ্টি-কল্পনার বিপরীত। বিজ্ঞান বলেন, প্রথমে উদ্ভিদের উৎপত্তি, তৎপরে জীবের এবং সর্ব্বশেষে মানবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এইরূপ ক্রমপ্রাদুর্ভূত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিজ্ঞানবেত্তাদের মধ্যে সর্ব্ববাদিসম্মত। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকে একথা বলেন যে, জাতি নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়; অর্থাৎ প্রত্যেক জাতীয় উদ্ভিদ্ বা জীব যেরূপ সৃষ্ট হইয়াছে, এখনও সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে, এবং অনন্ত ভবিষ্যৎকালেও অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। যত্ন ও শিক্ষাদ্বারা গুণের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। কোন জাতীয় বৃক্ষ যত্নে

রোপিত ও লালিত হইলে, তাহার আয়তন ও ফলপুষ্পাদি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তাহা যে জাতীয় উদ্ভিদ্, সে জাতি হইতে পৃথগ্‌ভূত হইবে না। তদ্রূপ কোন জাতীয় জীব (যেমন কুকুর) শিক্ষা ও যত্নদ্বারা অধিকতর বলবিক্রম লাভ করিতে পারে এবং অধিকতর পরিমাণে মানবের উপযোগী হইতে পারে; কিন্তু তাহা বলিয়া উহার পক্ষে জাত্যন্তরে পরিণত হওয়া সম্ভাবিত নহে। লোকে বলে "গাধা পিটিয়া ঘোঁড়া হয় কি?" আমাদের সমগ্র দর্শন ও ইতিহাস জাতির অপরিবর্ত্তনীয়তাবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, ইহার অপলাপ করা অসমসাহসিকতার কার্য্য। ইজিপ্ত-দেশের গত তিন হাজার বৎসরের ইতিহাস পরিজ্ঞাত আছে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে উক্ত দেশস্থ কোন জন্তু বা উদ্ভিদ্ জাত্যন্তরে পরিণত হয় নাই, বরং এরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখনও সেই প্রকার রহিয়াছে, কাহারও প্রকৃতিগত কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

প্রতিবাদীরা উক্তপ্রকার যুক্তি প্রকটন করেন; এখন ডারুয়িন কি বলেন, বিবৃত হইতেছে। বানর হইতে মনুষ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইহা তাঁহার মতের একাংশমাত্র। তাঁহার সমগ্র মত কি, তাহাই অগ্রে অনুধাবন করা যাউক। তিনি বলেন কোন জাতীয় উদ্ভিদ্ বা জীব চিরস্থায়ী নহে; সকলেই কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এ পরিবর্ত্তন আন্তরিক, কেবল বাহ্য নহে; ইহাতে শুদ্ধ গুণান্তরাধান হয় এমন নহে, প্রকৃতিগত প্রভেদও জন্মে। এ পরিবর্ত্তনের নাম, এক জাতীয় উদ্ভিদ্ বা জীব হইতে অন্য জাতির প্রাদুর্ভাব। এই প্রাদুর্ভাব ক্রমিক; অর্থাৎ যুগধর্ম্মানুসারে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট, ঋজু হইতে জটিল, ক্রমশঃ উদ্ভূত হইতেছে। প্রথমে এই পৃথিবীতে কতিপয় জাতি মাত্র বিদ্যমান ছিল; পরে অসীম কালসহকারে সেই কয়েকটা হইতে অসংখ্যজাতীয় উদ্ভিদ্ ও জীবের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। ডারুয়িন এমন আভাসও দিয়াছেন যে, সৃষ্টি প্রক্রিয়ার চরম আদি ধরিতে গেলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, একমাত্র জাতি হইতে বর্ত্তমানের যাবতীয় জাতি অপরিসীম কাল সহকারে ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাহা হইলে উদ্ভিদ্ হইতে জীবের সৃষ্টি, এরূপ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। হারবার্ট স্পেনসরের মতে জড় হইতে উদ্ভিদ্ ও জীবের প্রাদুর্ভাব

হইয়াছে। বস্তুতঃ পরমাণুর অস্তিত্ব মানিতে গেলে এইরূপ সৃষ্টি-কল্পনা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। সংহিতা ও পুরাণে যাহাই থাকুক, ভারতীয় দর্শনের মত ইহার বিপরীত নহে।

ডারুয়িন সাহেব নিজের মত-সংস্থাপনার্থ যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। তাঁহার যুক্তিসমূহ কতদূর সারবান্ ও অখণ্ডনীয়, পাঠক স্বয়ং বিচার করিয়া দেখিবেন।—ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ভূপঞ্জরের নিম্নতর স্তরে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক উদ্ভিদের ও জীবের চিহ্ন পাওয়া যায়; কিন্তু যত ঊর্দ্ধস্থিত স্তরে উঠা যায়, তত অধিকসংখ্যক জাতির উপলব্ধি হইতে থাকে। ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিন্ন ভিন্ন যুগে সংঘটিত হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বতনকালে অল্পসংখ্যক জাতি বিদ্যমান ছিল; অধুনাতন কালে ক্রমশঃ অধিকতর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে আদিমকাল অপেক্ষা উত্তরকালে নূতন নূতন জাতির যে চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা কি আজগবী? তাহা কি শূন্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে? তাহার কি কোন উপাদান কারণ নাই? যুক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জাতি হইতেই উত্তরোত্তর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা ভূয়োদর্শনে কি দেখিতেছি? দুই তিন পুরুষের মধ্যে পারাবত, কুক্কুর, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু যত্ন ও শিক্ষার গুণে অনেকাংশে সম্পূর্ণ পৃথক্ আকার ও গুণ প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদগণেরও কালসহকারে এইরূপে উৎকর্ষাধান হইয়া থাকে। মানব কেবল উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঈদৃশ অল্পকালের মধ্যে কত না পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইতেছেন! পরন্তু মানুষের জ্ঞান বস্তুর প্রকৃতি ও আন্তরিক অবস্থার মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ নহে; যে জন্তু বা বৃক্ষাদি যে অংশে তাঁহার উপযোগী, তিনি সেই জন্তুর ও বৃক্ষাদির সেই অংশের উন্নতিসাধন করিয়া থাকেন। তাহাতেই দুই তিন পুরুষের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালী ও ক্ষমতার বিষয় একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহা একটী স্বাভাবিক নিয়ম যে, কোন জীব ও উদ্ভিদের যে অংশটী ও যে গুণটী তাহার নিজের পক্ষে হিতকর, প্রকৃতি সেই অংশ ও সেই গুণের রক্ষণ ও পোষণ করিয়া থাকেন। তাহাতে এই ঘটে যে, অপেক্ষাকৃত অধিক গুণসম্পন্ন ও প্রবল জীব বা উদ্ভিদ্ অধিককাল জীবিত থাকে এবং সন্তান সন্ততি

রাখিয়া যাইতে পারে। এই সংসারে অস্তিত্বের নিমিত্ত নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। যে অধিক প্রবল ও গুণসম্পন্ন সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া আপনার জন্য স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে। যে বলহীন ও নির্গুণ, সে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাবে ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পরিশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। একটা স্থানে নানাজাতীয় বীজ বপন কর; দেখিতে পাইবে যে, কয়েক জাতীয় বীজের অঙ্কুরোদ্গম পর্য্যন্ত হইবে না। যে সকল বীজ অঙ্কুরিত হইবে, তাহার মধ্যে সকলের চারা কিছু সমানভাবে বর্দ্ধিত হইবে না। তাহার মধ্যে আবার কতকগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর কতকগুলি কৃশ ও নিস্তেজ হইবে। পরিশেষে দেখিতে পাইবে, যে সকলজাতীয় বীজ বপন করিয়াছিলে, তাহার মধ্যে অনেকে বিলুপ্ত হইয়াছে, কতকগুলি নিস্তেজভাবে জন্মিতেছে; কেবল কিয়দংশমাত্র বিলক্ষণ সতেজভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে, পরিণামে তাহারাই জীবিত থাকিয়া সেই স্থান অধিকার করিয়া লইবে। এই নিয়ম সর্ব্বত্র চলিতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভাবে যেমন ব্যক্তিবিশেষের ধ্বংস, তেমনি জাতিবিশেষেরও অস্তিত্বলোপ হইতেছে। এমন অনেক জীব ও উদ্ভিদের চিহ্ন ভূগর্ভে নিহিত আছে, যাহা বর্ত্তমানে জীবিত নাই। ইহা কি সম্ভব নহে, যে সকল জাতি বর্ত্তমানে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে কালে বিলুপ্ত হইবে? প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি কারণে অহরহ কত জীবের যে ধ্বংস হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। কিন্তু এরূপ ধ্বংস না হইলে, পৃথিবীতে স্থান কুলাইত না এবং সকলের জন্য আহারের সংস্থান হইত না। বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে মনুষ্য-সংখ্যার দ্বৈগুণ্য হইয়াছে। এই হারে প্রজাবৃদ্ধি হইলে, কতিপয় সহস্র বৎসর পরে আমাদের সন্তান সন্ততিগণের জন্য পৃথিবীতে আর স্থান হইবে না। নানা নৈসর্গিক কারণে জীবক্ষয় হইতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্নাভাব, রোগ, ও মৃগয়া প্রভৃতি তাহার মধ্যে প্রধান। এরূপ জীবক্ষয় না হইলে, যে কোন জাতির এতবৃদ্ধি হইতে পারে যে, তাহাতেই ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে।

আমরা একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। যাবতীয় জাতির মধ্যে হস্তীর উৎপাদিকাশক্তি কম। এই জন্তু ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। অতএব একটী হস্তিদম্পতী হইতে তিন

জোড়া অর্থাৎ ছয়টী শাবক উৎপন্ন হয় ধরিলে, অধিক হইল না। এই হারে যদি বৃদ্ধি হয়, আর আদৌ ক্ষয় না হয়, তাহা হইলে পঞ্চশত বৎসরের পর পঞ্চদশ লক্ষ হস্তী ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেক। তাহাদের খাদ্য যোগান বড় সহজ ব্যাপার হইবে না। আচার্য্য লিনিয়স বলেন, পৃথিবীতে এমন কোন উদ্ভিদ নাই, যাহার দুইটী করিয়া বীজ প্রতি বৎসর না জন্মে। তাহা হইলে, যদি একটী বৃক্ষের বৎসরে দুইটী করিয়া চারা হয়, বিংশতি বৎসরে সেরূপ দশ লক্ষ বৃক্ষ জন্মিয়া পৃথিবীর কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইবেক। অতএব প্রতীত হইতেছে, যেমন ক্ষয় ও হ্রাস, তেমনি উৎপত্তি ও স্থিতি প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে চলিতেছে। যে সারযুক্ত ও গুণসম্পন্ন, তাহা রক্ষিত হয়; কিন্তু যে নিস্তেজ ও নিকৃষ্ট সে বিনাশিত হয়। প্রকৃতির এই প্রক্রিয়াকেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural seleotion) বলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ বা জীব আপনা হইতে উৎকৃষ্ট জাতির উৎপাদন করিয়া,ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া,হয় একবারে বিলুপ্ত হয়, না হয় হীনভাবে অবস্থান করে। সন্নিকৃষ্ট জাতিদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা যত অধিক, বিপ্রকৃষ্ট জাতিদ্বয়ের মধ্যে তত নহে। জলজন্তু ও স্থল জন্তুতে যাদৃশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উভয় জল জন্তুর মধ্যে তদপেক্ষা অধিক; ডারুয়িন সাহেব বলেন যে,প্রকৃতির এই প্রক্রিয়া (অর্থাৎ একজাতি হইতে অন্য জাতির উৎপত্তি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধন সারহীন জাতির ক্ষয়,) যে সকল যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহা অকাট্য; কিন্তু তাহা বলিয়া, এমতের প্রতিকূলে কতকগুলি আপত্তি হইতে পারে না এমন নহে। সেই সকল আপত্তির মধ্যে কতিপয়ের নিরাস হইতে পারে। অবশিষ্টগুলি আমাদের জ্ঞানোন্নতির সহিত তিরোহিত হইবে, আপাততঃ তাহার খণ্ডন সুসাধ্য নহে। তবে যে, প্রতিবাদীরা বলেন, ভূয়োদর্শনে ও ইতিহাসে এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা একজাতি হইতে অন্যের প্রাদুর্ভাব ও জাতিবিশেষের লোপ প্রতিপন্ন হইতে পারে; তদুত্তরে এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে, মানবজাতি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। তাহার ইতিহাস আবার অতি স্বল্পকালসম্বন্ধীয়। এদিকে প্রকৃতির প্রক্রিয়া নিতান্ত মন্থর। যুগ যুগান্তরে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং তাহা যে কারণসমূহ হইতে সম্পাদিত হয়, তাহার অধিকাংশ মনুষ্যের পরিচিত নহে। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায়

উক্ত বিষয়ে সমুচিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু কালে যে পাওয়া যাইবেক, তাহাতে সংশয় করা সঙ্গত নহে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

মহাপণ্ডিত ডারুয়িন যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ইতিবৃত্ত অতীব কৌতুকাবহ। চিরন্তন সংস্কারের বিপরীত মত কত কষ্টসৃষ্টে অগ্রসর হয়, তাহা সেই ইতিবৃত্তপাঠে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। বিশেষতঃ যাহা স্থূল দৃষ্টিতে স্বতঃসিদ্ধ বোধ হয় এবং যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, সে মতের অনুকূলে যত কেন তর্ক থাকুক না, তাহার প্রতিষ্ঠা বহুকালের প্রয়াস ও পরীক্ষাসাপেক্ষ। ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে যে, ১৭৯৪—৯৫ খৃঃ অব্দে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান তিনটী দেশে যুগপৎ এই মহৎ মতের প্রথম আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডারুয়িনের পিতামহ ইংলণ্ডে, সুপ্রসিদ্ধ কবি গেটি জর্ম্মণিতে এবং সেণ্ট হেলেয়ার ফ্রান্সে এই কথা উত্থাপন করেন যে, উদ্ভিদ ও জীবগণ সৃষ্টির সময় হইতে একভাবে রহিয়াছে এমন নহে, কিন্তু নানা পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে ফরাসিস্ পণ্ডিত সেণ্ট হেলেয়ার বলেন, যদিও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা নিবন্ধন এই সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি আমার বিশ্বাস এই যে, বর্ত্তমানে জাতি-পরম্পরায় আর কোন পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর হইতেছে না। তৎপরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিস প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ লামার্ক কয়েকখানি গ্রন্থে উক্ত মতের সমর্থন করেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম স্পষ্টাভিধানে নির্দ্দেশ করেন যে, কি জড়প্রকৃতিতে কি জীবপ্রকৃতিতে যাহাকে যত প্রক্রিয়া হইতেছে, তৎসমস্ত চিরস্থায়ী নিয়মের অধীন, সময়ে সময়ে ঐশী শক্তির পরিচালনে সংঘটিত হয় এমন নহে। অতএব তৃণ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমুদয়ই বিভিন্ন জাতি হইতে যথাক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে। লামার্ক বলেন, যদি জাতি সকল পৃথক পৃথক সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহাদের আকার প্রকার, অবস্থা কার্য্য প্রভৃতি সর্ব্বতো-ভাবে বিসদৃশ ও বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু প্রকৃতিতত্ত্ববিদেরা অবগত আছেন, যখন কোন প্রকার জীবকে (যেমন "স্তন্যপায়ী") নানা জাতিতে

এবং তদন্তর্গত জাতিগুলিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; তখন কোন্ বিভাগটীকে জাতি, কোন্ বিভাগটীকে বা শ্রেণী বলা উচিত, তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। প্রত্যেক জাতি পৃথক পৃথক সৃষ্ট হইলে, এরূপ সন্দেহ ঘটিবার বিষয় কি? পরন্তু যদি আমরা গৃহপালিত জন্তুদিগের রূপান্তর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে প্রকৃতিতে এরূপ পরিবর্ত্তন কোন মতে অসম্ভব বোধ হয় না।

প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন নানা কারণে সংঘটিত হয়। কতক আবহাওয়া, খাদ্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে, কতক বিভিন্ন জাতির পরস্পর সংসর্গে, কতক বা অভ্যাসের গুণে ঘটিয়া থাকে। লামার্ক পরিশেষে একটী নিতান্ত অযৌক্তিক মতের পোষকতা করেন। তিনি বলেন, যখন সকল জাতিই অধম হইতে ক্রমশঃ উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তখন এরূপ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য যে, যে সকল নিতান্ত হীনজাতীয় জীব ভূমণ্ডলে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়, তৎসমস্ত অধুনা আপনা হইতেই উদ্ভূত হইতেছে; তত্তৎস্থলে ক্রমিক প্রাদুর্ভাবপ্রণালী আর খাটিতেছে না।

অনন্তর ১৮৩১ অব্দে প্যাট্রিক ম্যাথিউ উক্ত মতের সমর্থন করেন। তাঁহার সঙ্গে ডারুয়িনের মতভেদ নাই। তবে তিনি জাতিপরিবর্ত্তনের বর্ণনস্থলে জীবের বাহ্য অবস্থাকে অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করিয়াছেন। "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" প্রক্রিয়ার কতদূর ক্ষমতা তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। অতএব ম্যাথিউ সাহেবকে ডারুয়িনের এক প্রকার গুরু বলিলেও চলে কিন্তু ডারুয়িন, তাঁহার নিকট আপনাকে ঋণী বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক, একখানি পত্র লিখিলে তিনি এই প্রত্যুত্তর দেন;—"যে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে একজাতি হইতে অন্য জাতির উৎপত্তি হয়, তাহা আমার নিকট একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ; প্রগাঢ় গবেষণার ফল নহে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে ডারুয়িন মদপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ডারুয়িন অল্পে অল্পে অতি সাবধানে যুক্তি ও ব্যাপ্তিজ্ঞানকে আশ্রয়পূর্ব্বক নানা বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া ক্রমশঃ এই মহৎ আবিষ্ক্রিয়াকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু ইহা আমার নিকট আবিষ্ক্রিয়া বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। আমি প্রকৃতির সাধারণ কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই স্থির করিয়াছি, এক জাতি

হইতে উৎকৃষ্টতর জাতিপরম্পরার সৃষ্টি হইতেছে। আমার নিকট এই ঘটনাটী স্বতঃসিদ্ধ। আমার বিশ্বাস এই যে, এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটী একবার স্পষ্টাভিধানে নির্দ্দিষ্ট হইলে, কোন কুসংস্কারহীন ব্যক্তি ইহায় প্রতি অশ্রদ্ধা করিবেন না।"

তৎপরে ১৮৪৪ অব্দে "সৃষ্টির চিহ্নাবলী" নামক একখানি পুস্তক প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে রচয়িতার নাম উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে জাতির অনিত্যতা ও পরিবর্ত্তনশীলতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার ইহাও বলেন, ঈশ্বর প্রত্যেকজাতীয় জীবকে এমন একটী শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, তন্নিবন্ধন তাহার আকার প্রকার জীবনাদির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া ক্রমে সম্পূর্ণ রূপান্তর সংঘটিত হয়। এই ঈশ্বরদত্ত পরিবর্ত্তনপ্রবণতাশক্তি না থাকিলে, কেবল বাহ্য অবস্থার প্রভেদ প্রযুক্ত একজাতি হইতে জাত্যন্তরের প্রাদুর্ভাব সম্ভবপর বোধ হয় না। এই গ্রন্থে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না; প্রত্যুত অনেক স্থলে ভ্রমপ্রমাদের সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হয়। তথাপি এই পুস্তক তীব্র ও উজ্জ্বল রচনার গুণে অবিলম্বে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইল এবং অপেক্ষাকৃত অধিক বিশুদ্ধ ও উন্নত মতের প্রচারার্থ সোপান করিয়া দিল।

অনন্তর ১৮৫২ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্সার "সৃষ্টি ও প্রাদুর্ভাব" নামক প্রবন্ধ প্রচার করিলেন। তিনি বলেন, অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে জাতি সকল পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে। যখন অবস্থাভেদনিবন্ধন গৃহপালিত জন্তুর এত পরিবর্ত্তন হইতেছে, যখন অবস্থাভেদ নিবন্ধন একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপন্ন হইতেছে, যখন অবস্থাভেদ নিবন্ধন শোণিত শুক্রের পরিণামে অদ্ভুত মানবদেহ উদ্ভূত হইতেছে, তখন ভূমণ্ডলে নূতন জাতিপরম্পরার উৎপত্তির জন্য কেবল ভৌতিক প্রক্রিয়া পর্য্যাপ্ত হইবে না, ঐশিকসৃষ্টি নামক একটী নূতন প্রক্রিয়ার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ তর্ক নিতান্ত অমূলক। স্পেন্সার সাহেব আরও আপত্তি করেন যে, জাতি সকল পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্ট হইলে, কোন্‌গুলি জাতি, কোন্‌গুলি বা একজাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, তাহা লইয়া এত বিসম্বাদ ঘটিত না। আরও দেখ, যদিও অনেক জাতি ভূমণ্ডল হইতে

কালে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি বর্ত্তমান জাতিপরম্পরার নিম্ন হইতে নিম্নতর ও উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্খলা যেরূপ সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে ক্রমিক প্রাদুর্ভাবেরই পক্ষে বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। নতুবা সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথমযুগে সরীসৃপের উৎপাদন করিলেন, তৎপরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া মৎস্যজাতির সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর তির্য্যক্‌জাতির সৃষ্টি করিলেন, এরূপ অনুমান অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এইপ্রকার সৃষ্টিকল্পনা গৌরব মাত্র এবং যুক্তি ও দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ।

১৮৫৮ অব্দে ওয়ালেস ও ডারুয়িন লিনীয়সীয় সভার পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিয়া "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" প্রক্রিয়া প্রতিপাদন করেন। পর বৎসর অধ্যাপক হক্‌সলি ও ডাক্তার হুকার উক্ত মতের অনুমোদন করেন। ১৮৫৯ অব্দের নবেম্বর মাসে ডারুয়িন সাহেব "জাতির নিদান" নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। তাহাতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও ক্রমপ্রাদুর্ভাব-প্রক্রিয়া সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। কিপ্রকার যুক্তিদ্বারা উহা সমর্থিত হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে তাহার আভাস দেওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি, কিরূপ প্রমাণ পরীক্ষা দ্বারা বানর হইতে নরের প্রাদুর্ভাব প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে ;—

মানবদেহের আন্তরিক গঠন ও ধাতুসকল পর্য্যালোচনা করিলে, নিকৃষ্ট জাতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য বোধ হয়। মাংসপেশী, শিরা, শোণিত প্রভৃতি নরদেহে যেরূপ, অন্যান্য জাতির দেহেও সেইপ্রকার। অধিক কি, মস্তিষ্কেরও অবস্থা সর্ব্বত্র সমান দেখা যায়; প্রভেদের মধ্যে মানবদেহে মস্তিষ্কের পরিমাণ শরীরের অন্যান্য অংশের সহিত তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক, তির্য্যক্‌দেহে অল্প; পরন্তু নিকৃষ্টজাতিও মানবের ন্যায় সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় ও উভয়েরই ক্ষতসংরোধ একপ্রকার ঔষধে সমাহিত হয়। মনুষ্য স্তন্যপায়িজাতির অন্তর্ভুক্ত। অপরাপর স্তন্যপায়ী জন্তুর সন্তানোৎপাদনক্রিয়া মনুষ্যের বংশবিস্তারকার্য্য হইতে পৃথক্ নহে। খাদ্যের গ্রহণ ও পরিপাক এবং তন্নিবন্ধন শোণিতাদির উৎপত্তি মনুষ্যে ও অন্যান্য জন্তুতে অভিন্ন। গর্ভাশয়ে শোণিতশুক্র প্রথমে যে অবস্থায় থাকে, তাহা মনুষ্যের ও নিকৃষ্টজাতিরপক্ষে একরূপ। কুক্কুর, বিড়াল, অশ্ব, বানর

প্রভৃতির প্রাথমিক ভ্রূণগুলির মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নাই, সম্পূর্ণ একাকার বিভিন্নজাতির ভ্রূণ যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের মধ্যে তত প্রভেদ লক্ষিত হইতে থাকে। তথাপি কেবল বৃদ্ধির চরমকালেই মানুষের ভ্রূণে ও বানরের ভ্রূণে সুস্পষ্ট বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায়; কিন্তু বৃদ্ধির প্রথম ও মধ্যম অবস্থাতে একটা কুক্কুরের ভ্রূণ হইতে মানুষের ভ্রূণ যত বিভিন্ন, বানরেরও ভ্রূণ তত বিভিন্ন দৃষ্ট হয়। ইহাতে অনুমিত হইতে পারে, যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বানরের সহিত নরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও অব্যবহিত। কেবল দেহের আভ্যন্তরিক গঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কেন, অন্যান্য বিষয়েও অপূর্ব্ব সাদৃশ্য রহিয়াছে। মানবের ন্যায় নিকৃষ্ট জাতিরও পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে। সুখদুঃখবোধ, ভয়-সন্দেহ, অপত্যস্নেহ প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল সর্ব্বসাধারণ। বিশেষতঃ, তির্য্যক্ জাতির মধ্যে উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুগণ মনুষ্যের ন্যায় স্মৃতি, অভিনিবেশ, কল্পনা, স্বপ্নপ্রবণতা, ব্যগ্রতা, ঈর্য্যা, বিস্ময়, কৌতূহল প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা ব্যাপৃত হইয়া থাকে। কুক্কুর, হস্তী, বীবর, বানর প্রভৃতি জন্তুর দৃষ্টান্ত মনে করিলে পাঠক এই বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণপরীক্ষা প্রাপ্ত হইবেন।" সমগ্র মানসিক বৃত্তির মধ্যে বিবেচনাশক্তি প্রধান। কিন্তু প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্গণ অবগত আছেন যে, উচ্চশ্রেণীস্থ তির্য্যক্দিগের অন্ততঃ কিছু পরিমাণে বিবেচনাশক্তি আছে। তাহারাও কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে অবস্থাভেদে পৃথক্ পৃথক্ মতলব অবলম্বন করিয়া থাকে। তৎসমস্তই সংস্কারের (Instinct) ফল বলিলে চলে না। কারণ সংস্কারগুণে অবস্থাভেদে কার্য্যভেদ নির্ব্বাচন করা সম্ভব নহে।

তথাপি এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, এই সকল সাদৃশ্য থাকিলেই পর্য্যাপ্ত হইল না; মনুষ্যে ও নিকৃষ্ট জাতিতে এত গুরুতর প্রভেদ আছে যে, একের উদ্ভব অন্য হইতে কোনমতে সম্ভব নহে। ক্রমিক উন্নতি, যন্ত্রী ব্যবহার, অগ্নিদ্বারা কার্য্যসাধন, অন্য জন্তুর বশীকরণ, অর্থসংগ্রহ ও ধনাধিকার, ভাষাসৃষ্টি, আত্মজ্ঞান, নির্দ্ধারণশক্তি, ব্যাপ্তিজ্ঞান, শোভানুভাবকতা, রহস্যজ্ঞান, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান, সদসদ্‌জ্ঞান প্রভৃতি কেবল মনুষ্যেরই আছে; এবং তন্নিমিত্ত মনুষ্য তির্য্যক্‌জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া পরিচিত হইতেছে।

উক্ত আপত্তির খণ্ডনার্থ আমরা বহু আড়ম্বর করিব না। মনুষ্য ও নিকৃষ্টজাতির মধ্যে যে মহৎ অন্তর আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, যেমন মনুষ্যে ও ইতর জন্তুতে প্রভেদ আছে, তেমনি মনুষ্যের এবং ইতর জন্তুর মধ্যে পরস্পর প্রভেদ আছে। বানরে ও নরে বিস্তর প্রভেদ সন্দেহ নাই। কিন্তু একদিকে বানর ও অসভ্য বুশমানকে রাখ, আর একদিকে গর্দ্দভ ও বানরকে রাখ, এবং অপরদিকে বুশমান ও ইংরাজকে রাখিয়া দাও। দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ, বানরে ও বুশমানে যে প্রভেদ, বুশমানে ও ইংরাজে কি তদপেক্ষা অল্প? না গর্দ্দভে ও বানরে তদপেক্ষা অল্প? বুশমানের ন্যায় বর্ব্বরজাতি হইতে যদি ইংরাজের মত সুসভ্যজাতির উদ্ভব সম্ভবপর বোধ হয়, তাহা হইলে সিম্পাঞ্জিনামক সুবুদ্ধি বানর হইতে বুশমানের উৎপত্তি কেন অসম্ভব হইবেক, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বানর অস্ত্রনির্ম্মাণ করিতে পারেনা সত্য, কিন্তু যুদ্ধার্থ ও নারিকেলাদি ভক্ষণার্থ উপলখণ্ড ব্যবহার করিয়া থাকে। গণিতশাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরদান তাহার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিলে, একটী সুরক্ষিত উদ্যান হইতে সুস্বাদু ফল অপহরণ করা যায়, তাহা স্থির করিতে সে অক্ষম নহে। বানর বিশ্বরচনার মনোহর কৌশল অবগত নহে, কিন্তু বানরীর রঙ্গীণ ত্বক্ ও কোমল লোমাবলীর সৌন্দর্য্য নির্ব্বাচনে কোনমতে অপটু নহে। সে সুস্পষ্ট শব্দবিন্যাসপূর্ব্বক কথাবার্ত্তা কহিতে পারেনা বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি করিয়া স্বজাতীয়ের নিকট নিজের মনোগত ভাব ও অভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। বানর মনুষ্যের ন্যায় নিঃস্বার্থ উপচিকীর্ষা অবগত নহে, কিন্তু স্বদলের রক্ষার্থ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হয় এবং বিপন্ন অনুচরের শাবকগুলির ভরণপোষণের ভারগ্রহণবিষয়ে পরাঙ্মুখ হয় না। এইরূপ উচ্চশ্রেণীস্থ বানরের সঙ্গে নিতান্ত নিম্নশ্রেণীস্থ বর্ব্বরেরও বিস্তর প্রভেদ আছে। নিম্নতম বর্ব্বর উলঙ্গদেহ, মৃগজীবী ও গুহাশায়ী হইলেও, অগ্নি ও অস্ত্রের ব্যবহার জানে এবং অন্যজন্তুর বশীকরণে সক্ষম। ঈশ্বরতত্ত্ব তাহার মনে স্থানপ্রাপ্ত না হউক, সে অদৃশ্য ভূত, প্রেত ও দৈত্যদানবের ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু ঈদৃশ বর্ব্বরের সঙ্গে সভ্যতার চূড়ামণিস্বরূপ ইংরাজের তুলনা করিয়া দেখ, এতদুভয়ে কত প্রভেদ

বুঝিতে পারিবে ; এবং সেই প্রভেদ বানর ও বর্ব্বরের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তদপেক্ষা অধিক, কি অল্প, কি সমান, তাহারও মীমাংসা করিতে সক্ষম হইবে।

আমরা নিকৃষ্ট জাতির মধ্য হইতে একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি ; তাহা অনুধাবন করিলে, বানর ও নরের পরস্পর প্রভেদ দর্শনে বিস্মিত হইবার তত কারণ থাকিবে না। প্রকৃতিতত্ত্ববিদেরা পিপীলিকা ও ককস নামক কীটকে এক-জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। স্ত্রীককস শৈশবাবস্থায় শুণ্ডদ্বারা একটা ক্ষুদ্র বৃক্ষে সংলগ্ন হয় ও তাহার রস নিঃসারণপূর্ব্বক পান করিতে থাকে। তার পর ডিম্ব প্রসব করে। কিন্তু সে স্থান হইতে নড়িয়া কখন অন্যত্র যাইতে পারে না। ককস জাতির জীবন এইরূপে অতিবাহিত হয়। এখন পিপীলি-কার জীবনচরিত বর্ণন করা যাউক। পিপীলিকারা পরস্পরকে খপরাখপর জানাইয়া থাকে, কোন একটী কার্য্যের নির্ব্বাহার্থ অথবা কোন প্রকার ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত অনেকে একত্র সমবেত হয়। তাহারা আবাসের জন্য প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করে, গৃহমার্জ্জন করে, এবং রাত্রিতে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখে। তাহারা রাস্তা প্রস্তুত করে, এবং সময়ে সময়ে নদীর নিম্নে সুড়ঙ্গ (Tunnel) নির্ম্মাণ করিয়া রাখে। তাহারা স্বদলের জন্য খাদ্য-সংগ্রহ করে, এবং যখনএরূপ কোন বৃহদাকার খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করে যে, তাহা দ্বার দিয়া প্রবেশিত হইতে পারে না, তখন দ্বার ভগ্ন করিয়া উহা আবার নির্ম্মাণ করিয়া লয়। পিপীলিকারা রীতিমত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হয় এবং সমাজের হিতার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হয়। তাহারা যুদ্ধের বন্দিগণকে ধরিয়া আনে। তাহারা নিয়মপূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করে এবং আপনাদের ডিম্বগুলি গৃহের মধ্যে শুষ্ক ও গরম স্থানে রাখিয়া দেয়, কেন না, তাহা হইলে ডিম্বগুলি শীঘ্র স্ফুটিত হইবে। ইত্যাদি কার্য্যপরম্পরাতে পিপীলিকার জীবন অতিবাহিত হয়। এখন দেখ, ককস ও পিপীলিকায় কত প্রভেদ। বানর ও নরের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তদপেক্ষা এই প্রভেদ, অল্প না অধিক ?

এখন কুসংস্কারবর্জ্জিতচিত্ত মাত্রেরই এরূপ প্রতীতি হইবে যে, প্রভেদ অল্পই হউক আর অধিকই হউক, উহা কেবল জাতীয় উৎকর্ষ ও নিকর্ষের

নিয়ামক হইতে পারে; উৎপত্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক প্রণালীর প্রতি-পোষক হইতে পারে না। পৃথক্‌সৃষ্টিবাদীরা একথা বলিতে পারেন যে, 'ডারুয়িন স্বমতের সমর্থনার্থ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। তিনি যদি অতীতের ইতিহাস বা বর্ত্তমানের পরীক্ষা দ্বারা এরূপ দেখাইতে পারিতেন যে, এক জাতি অন্য জাতি হইতে উদ্ভূত হইতেছে কিংবা হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতাম। নতুবা শুদ্ধ সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া একটী চিরন্তন মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি।" এইরূপ আপত্তিকারীদিগকে ডারুয়িন সাহেব বলিতে পারেন, "আপনারা যে বলেন, জাতি সকল পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কি কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শাইতে পারেন? আপনারা অন্যকে প্রমাণের জন্য পীড়াপীড়ি করেন কিন্তু নিজের বেলা কোন প্রমাণের আবশ্যকতা বিবেচনা করেন না। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য কথা। আপনাদের মত চিরন্তন বলিয়া গ্রাহ্য, আর আমাদের মত আধুনিক বলিয়া অগ্রাহ্য, এরূপ তর্ক চলিতে পারে না। জ্যোতিঃশাস্ত্রে টলেমির মত পুরাতন, আর কোপার্ণিকসের মত নূতন। তবে কেন টলেমির মত পরিত্যক্ত ও কোপার্ণিকসের মত সর্ব্বত্র সমাদৃত হইল? পরন্তু সুধীবর হম্‌বোল্ট গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ভূমণ্ডলে ৩২০,০০০ জাতীয় জীব ও ২,০০০,০০০ জাতীয় উদ্ভিদ আছে। এই সকল বর্ত্তমান জাতিতে যদি বিলুপ্ত জাতিসমূহ যোগ করা যায়, তাহা হইলে উদ্ভিদে ও জীবে সর্ব্বশুদ্ধ অন্যূন এক কোটি জাতি হইয়া পড়ে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, দুই পক্ষের কোন পক্ষ অধিক সম্ভবপর। সৃষ্টিকর্ত্তা এক কোটিবার পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি করিয়াছেন, না জাতিপরম্পরা নিকৃষ্টতর জাতি হইতে পর্য্যায়ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে? দৃষ্টান্ত কি বলিয়া দিতেছে না যে, বর্ত্তমানেও একজাতি হইতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী উৎপন্ন হইতেছে?

"এই সকল শ্রেণী যে, কালে পৃথক্ পৃথক্ জাতিরূপে পরিণত হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কি কোনও কারণ আছে? পরন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ব্বত্র সাম্ভবিত নহে, সর্ব্বত্র অভ্রান্তও নহে। জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ লব্ধ হয় না, বরং অনেক স্থলে প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ ও আপাততঃ অসম্ভব বিষয় সকল নিঃসংশয়রূপে সমর্থিত ও পরিণামে সর্ব্বত্র

পরিগৃহীত হইতে দেখা যায়। যাহা যুক্তি ও অনুমানে পাওয়া যায় এবং যাহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ নহে, তাহাই বিশ্বাসযোগ্য ও অবলম্বনীয়। এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, ক্রমপ্রাদুর্ভাববাদের অনুকূলে যুক্তি আছে কি না এবং তাহা কোন প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ কি না? কিন্তু ইতি-পূর্ব্বেই সপ্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, এই মতের অনুকূলে অনেক যুক্তি আছে এবং ইহা অদ্যপর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত তাবৎ প্রাকৃতিক নিয়মের অনুযায়ী। তবে ইহার গ্রহণবিষয়ে এত সঙ্কোচ ও সংশয় কেন? এখন প্রতিবাদীকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, তিনি যে জাতির পৃথক্ সৃষ্টি মানেন তাহা কিরূপ? প্রথম সৃষ্ট জীবগণের পৃথিবীতে আবির্ভাবই বা কি প্রকারে হইল? তাহারা কি আকাশ হইতে পতিত হইল, অথবা বিধাতা পৃথিবী হইতে মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক কুম্ভকারের ন্যায় এক একটী জীব গড়িলেন? যদি এই সকল প্রকারে সৃষ্টিক্রিয়া অসম্ভব হয়, তবে কোন্ প্রণালীতে সম্ভব, তাহা পৃথক্-সৃষ্টিবাদীকে বলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু আমরা অনুমান করি, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বিষয়ে তাঁহার নিজেরই কোনরূপ নিশ্চিত জ্ঞান নাই; থাকাও অসম্ভব।"

আমরা এই প্রস্তাবের আয়তন আর বৃদ্ধি করিব না। কিন্তু উপসংহারে সাধারণের একটী কুসংস্কার দূর করা উচিত বোধ হইতেছে। ডারুয়িন সাহেব স্পষ্টাক্ষরে এরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন না যে, বানর হইতেই নরের উৎপত্তি হইয়াছে। তবে ইহা নিশ্চিত যে, জাতিপরম্পরার মধ্যে বানরের সহিত নরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। হয় ত বানর হইতে অন্য কোন উৎকৃষ্টতর জন্তু উদ্ভুত হইয়া মানবের উৎপাদনপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ ঘটনা অসম্ভব না হইলেও ইহার কোন নিদর্শন অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যাহা হউক, সাক্ষাৎসম্বন্ধেই হউক আর পরম্পরাসম্বন্ধেই হউক, বানর হইতে যে নরের উদ্ভব, ইহা ডারুয়িনের ধ্রুবজ্ঞান। বানরের সঙ্গে যে নরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা প্রাচীন ভারতে অপরিজ্ঞাত ছিল না। নরশব্দ হইতে বানরশব্দের উৎপত্তি এবং বানরশব্দের অর্থ যে নরসদৃশ, তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বানরকে হেয়জ্ঞান করিতেন না। তাহা হইলে রামায়ণ কবি ইন্দ্রাদিদেবের বানরাবতার,

বানরজাতির তত বল বিক্রম এবং রামচন্দ্রসভায় তাহাদের তত সমাদর বর্ণন করিয়া ভারতবাসীর নিকট প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিতেন না। মনুষ্যের জাত্যভিমান বড়ই প্রবল; তন্নিমিত্ত তিনি প্রাচীনকালে আপনাকে দেব অংশে উৎপন্ন বলিয়া বর্ণন করিতেন এবং অধুনাও নিকৃষ্ট জাতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হন। সাধারণ লোকে এরূপ করে করুক, কিন্তু ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে যে, প্রকৃতিতত্ত্ববিদেরাও মানব ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুর আকার প্রকার স্বভাবাদি অবগত হইয়াও এরূপ অভিমানের ও কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইবেন। যাহা হউক যে দিন তাঁহাদের মন হইতে এরূপ অভিমান ও কুসংস্কার তিরোহিত হইবেক, সেদিন বড় দূরবর্ত্তী নহে।

মহাভারত।

শ্রী

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণসহ কাম্যকবনে যাত্রা।

স্বর্গে গেলা সুরপতি, হইয়া সানন্দমতি,
যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর।
আপনার ভাগ্য জানি, সফল করিয়া মানি,
আনন্দ বিধানে পরস্পর॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি, লোমস ধৌম্যের প্রতি,
কহিলেন করি যোড়কর।
আজ্ঞা কর মহাশয়, যে কর্ম্ম করিতে হয়,
তাহা কহ করি অতঃপর॥
বসতি কোথায় করি, কর আজ্ঞা, শিরে ধরি,
সেই স্থানে করিব গমন।
কহিল লোমস তবে, কাম্যবনে চল সবে,
সার যুক্তি লয় মম মন॥
ধৌম্য বলে কব যত, সকলি মনের মত,
যুধিষ্ঠির মানেন সকল।
শুনিয়া ধর্ম্মর সেতু, গমনস্বচ্ছন্দ হেতু,
ঘটোৎকচে স্মরণ করিল॥
সত্যশীল ধর্ম্মমণি, হিড়িম্বানন্দন জানি,
শীঘ্রগতি হৈল উপনীত।
সবারে প্রণাম করে, দাণ্ডাইল যোড়করে,
দেখি রাজা আনন্দে পূরিত॥

তবে ঘটোৎকচ কয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
কি কারণে করিলা স্মরণ।
ধর্ম্ম কহিলেন কথা, কাম্যককানন যথা,
নিয়া চল করিব গমন॥
শুনি ভীম-অঙ্গজনু, বাড়াইলা নিজ তনু,
করিলেন বিস্তার যোজন।
তবে ধর্ম্ম নরপতি, সবান্ধবে শীঘ্রগতি,
করিলেন তাহে আরোহণ॥
ভীমের নন্দন ধীর, পরাক্রমে মহাবীর,
অনায়াসে করিল গমন।
নাহি মনে কিছু ভ্রম, তিলেক না হয় শ্রম,
উত্তরিলা কাম্যক কানন॥
মৃগ পশু বিহঙ্গম, বনস্থলে পূর্ণতম,
বৃক্ষগণ শোভে ফল ফুলে।
কৌতুকবিধানে তবে, আশ্রম করেন সবে,
পুণ্যতীর্থ প্রভাসের কূলে॥
সবার সানন্দ মন, বনে গিয়া ভীমার্জ্জুন,
মৃগয়া করিয়া নিত্য আনি।
কেবল সূর্য্যের বরে, ভুঞ্জায় সবার তরে,
রন্ধন করেন যাজ্ঞসেনী॥
এমন সানন্দ মনে, বসতি করেন বনে,
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ সহোদর।
এক দিন নিশাশেষে, আসিয়া ধর্ম্মের পাশে,
কহিছে লোমস মুনিবর॥
শুন ধর্ম্ম নরপতি, যাইব অমরাবতী,
তুষ্ট হয়ে করহ বিদায়।
শুনি ভাই পঞ্চজনে, আসিয়া বিরস মনে,
পড়িল প্রণাম করি পায়॥

লোচনসলিলে রাজা, বিধিমতে করি পূজা,
বহু স্তুতি করিলেন শেষে।
কহিয়া সবার স্থানে, পরমসন্তোষ মনে,
মহামুনি গেল স্বর্গবাসে ॥
ধর্ম্ম-আগমন শুনি, আইল যতেক মুনি,
ক্রমে ক্রমে যত বন্ধুজন।
ধর্ম্মেতে ধর্ম্মের সভা, উপমা তাহার কিবা,
হস্তিনা হইল কাম্যবন ॥
বলরাম জগন্নাথ, যতেক যাদব সাথ,
গেলেন ধর্ম্মের অন্বেষণে।
যত পরিবার সঙ্গে, আনন্দপ্রসঙ্গ রঙ্গে,
উপনীত রম্য কাম্যবনে ॥
কৃষ্ণ-আগমন শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি
অমৃতে সিঞ্চিল কলেবর।
আনন্দে মন্দির পুর, অগ্রসরি কত দূর,
সবান্ধবে পঞ্চ সহোদর ॥
চিরদিন অদর্শনে নমস্কার আলিঙ্গনে,
আশীর্ব্বাদ সুমঙ্গল ধ্বনি।
বসেন কৌতুকমতি, রামকৃষ্ণ ধর্ম্মপতি,
সবান্ধবে আর যত মুনি ॥
বলরাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চজন,
জিজ্ঞাসেন কুশল বারতা।
শুনিয়া কহেন ধর্ম্ম, হইল যতেক কর্ম্ম,
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব কথা ॥
শুনি রাম যদুপতি, আনন্দে প্রসন্ন অতি,
প্রশংসা করেন পার্থবীরে।
তবে তায় কতক্ষণে, চলিলেন সর্ব্বজনে,
স্নানহেতু প্রভাসের তীরে ॥

জলক্রীড়া করি সবে, আসিয়া আশ্রমে তবে,
ভোজন করেন পরিতোষে।
যথাসুখে আচমন, করি শেষে সর্ব্বজন,
বসিলেন হরিষ-মানসে ॥
হেনকালে যদুবীর, সম্বোধিয়া যুধিষ্ঠির,
কহিলেন সুমধুর বাণী।
তোমার ভাগ্যের কথা, এমনি করিল ধাতা,
বনেতে হস্তিনা তুল্য মানি ॥
যতেক দেখহ কর্ম্ম, সকলের সার মর্ম্ম,
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মী বলবন্ত।
অধর্ম্মী যে জন হয়, চিরদিন নাহি রয়,
অল্প দিনে অধর্ম্মীর অন্ত ॥
ইহা জানি ধর্ম্মরাজ, সাধিয়া আপন কাজ,
সত্যে না হইবে বিচলিত।
পূর্ব্বে মহাজন যত, সবাকার এক পথ,
কেহ নাহি করিল অনীত ॥
সত্য জান মহাশয়, তোমার এ দুঃখ নয়,
বহু দুঃখে দুঃখী দুর্য্যোধন।
বিপুল বৈভব যত, নিশার স্বপন মত,
অল্প দিনে হইবে নিধন ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি, সত্য সত্য যত মুনি,
কহিল ধর্ম্মের সন্নিধানে।
নিশ্চয় জানিবে তুমি, ভবিষ্য কহিনু আমি,
অল্প দিনে ক্ষয় দুর্য্যোধনে ॥
আশীর্ব্বাদ করি তবে, যথাস্থানে গেল সবে,
বন্ধুগণ হইয়া বিদায়।
আশ্বাসিয়া সর্ব্বজনে, গেল সবে নিজ স্থানে,
দুঃখিত-অন্তর ধর্ম্মরায় ॥

তবে রাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চজন,
চাহিলেন বিদায় বিনয়ে।
আজ্ঞা কর ধর্ম্মপতি, যাব তবে দ্বারাবতী,
কহ যদি প্রসন্ন হৃদয়ে॥
ধর্ম্ম উক্তি মৃদুভাষে, অবশ্য যাইবে দেশে
রাখিবে আমার প্রতি মন।
কি আর কহিব আমি, সকল জানহ তুমি,
চক্ষু দুই রাম নারায়ণ॥
হেন করি সম্বিধান, বিদায় হইয়া যান,
রেবতীশ সত্যভামাপতি।
রথে চড়ি সবান্ধবে, নানা কাব্য মহোৎসবে,
উপনীত যথা দ্বারাবতী।
সবে গেল নিজ ঘর, হেথা পঞ্চ সহোদর,
কাম্যবনে করিয়া আশ্রয়।
জপ যজ্ঞ দান ব্রত, নানা ধর্ম্ম অবিরত,
করি নিত্য সানন্দ হৃদয়॥
বনেতে বিচিত্র কথা, ব্যাসের চরিত্র-গাথা,
বর্ণিবারে কাহার শকতি।
গীতচ্ছন্দে অভিলাষ, ভনে দ্বৈপায়ন দাস,
কৃষ্ণপদে মাগিল ভকতি॥

দুর্য্যোধনের সপরিবারে প্রভাসতীর্থে যাত্রা।

জনমেজয় বলিলেন কর অবধান।
শুনিতে বাসনা বড় ইহার বিধান॥
সর্ব্বজন গেল যদি হইয়া বিদায়।
কি কর্ম্ম করিল সবে রহিয়া কোথায়॥
মুনি বলে সাবধানে শুন কুরুবর।
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর॥
প্রভাস তীর্থের তীরে বিচিত্র কানন।
ফল পুষ্প অপ্রমিত মৃগ পশুগণ॥
মৃগয়া করেন নিত্য বীর ধনঞ্জয়।
রন্ধনে দ্রুপদসুতা সানন্দহৃদয়॥
তীর্থ করি আইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
শ্রুতমাত্র মিলিলেন পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ॥

পূর্ব্বমত ভোজন করয়ে বৃন্দে বৃন্দে।
লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞসেনী রান্ধেন আনন্দে॥
এইমত পঞ্চ ভাই কাননে নিবসে।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা আনন্দেতে ভাষে॥
বিপুল বিভব ভোগ করে ইন্দ্রপ্রায়।
অর্থ রাজ্য সৈন্য যত কহনে না যায়॥
নিজ রাজ্য ধর্ম্মরাজ্য একত্র মিলিত।
বিশেষ যে রাজ্য হৈল তাহে অনুগত॥
সে সকল রাজা হৈল তাহে অনুগত।
কর দিয়া সবাই থাকয়ে শত শত॥
অশ্ব গজ পত্তি যত কে করে গণনা।
সমুদ্র সমান সব অপ্রমিত সেনা॥
ইন্দ্র দেবরাজ যেন অমরসমাজে।
দুর্য্যোধন মহারাজ পৃথিবীর মাঝে॥
এক দিন সভায় বসিয়া কুরুপতি।
শকুনি বলিছে তাঁরে শুন পৃথ্বীপতি॥
উজ্জ্বল ভারতবংশ হৈল তোমা হৈতে।
তুমি মহারাজ হৈলা ভুবন মাঝেতে॥
তোমার সমানরূপ না দেখি বিপক্ষ।
কর দিয়া সেবে তোমা রাজা লক্ষ লক্ষ॥
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল।
কুবের জিনিয়া রত্নভাণ্ডার সকল॥
বিপুল বৈভব তব ইন্দ্রের সমান।
কিন্তু মনে করি আমি এক মন্দ জ্ঞান॥
যেই পুষ্প না হইল ঈশ্বর পর্য্যাপ্ত।
যে ধনেতে নাহি হয় ব্রাহ্মণ সুতৃপ্ত॥
যে সম্পদ ভুঞ্জিয়া বান্ধব নহে তুষ্ট।
যে সম্পদ শত্রুগণ না করিল দৃষ্ট॥
সে সকল ব্যর্থ করি পূর্ব্বাপর কয়।
এই অনুতাপ মম জাগিছে হৃদয়॥
সদা তৃপ্ত আছে তব গুণে যত বন্ধু।
পৃথিবী পূরিল তব শুদ্ধ যশ ইন্দু॥
এ সকল অতুল ঐশ্বর্য্য যে হইল।
সবে মাত্র এ সম্পদ শত্রু না দেখিল॥
পূর্ব্বে ভাল মন্ত্রণা না করিলাম সব।
দেশ ছাড়ি বনে পাঠাইলাম পাণ্ডব।
নগরের অন্তে রাখিতাম দিয়া স্থল।
নিত্য নিত্য দেখাতাম বিভূতি সকল॥
দৃষ্টানলে দগ্ধ সদা হৈত পঞ্চজন।
অসহ্য বজ্রের সম বাজিত সঘন॥
কোথায় রহিল গিয়া নির্জ্জন কাননে।
তোমার ঐশ্বর্য্য এত জানিবে কেমনে॥
কর্ণ বলে কহিলা গান্ধার-অধিকারী।
ইহা অনুশোচি আমি দিবস শর্ব্বরী॥
নারীর যৌবন যেন স্বামীর বিহনে।
বল তথা ব্যর্থ না দেখিলে শত্রুগণে॥
বিভব বিনষ্ট হয় বৈরীরে রাখিলে।
বিধির নিয়ম ইহা জানি আমি ভালে॥
যত দিন ইহা সব না দেখে পাণ্ডব।
লাগয়ে আমার মনে বিফল এ সব॥
কিন্তু এক করিয়াছি বিচারনির্ণয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয়॥
প্রভাসতীর্থের তীরে তপস্বীর বেশে।
শত্রু সুখে বঞ্চিত বঞ্চয়ে নানা ক্লেশে॥
চল সবে যাব তথা স্নান করিবারে।
হইবে অনন্ত পুণ্য স্নানে তীর্থনীরে॥

হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গদল।
সবাকার পরিবার ভৃত্যাদি সকল॥
ইন্দ্রের অধিক তব বিপুল বৈভব।
দেখিয়া দ্বিগুণ দগ্ধ হইবে পাণ্ডব॥
ঘোষযাত্রা করি সর্ব্বলোকেতে কহিবে।
কিন্তু ভীষ্মদ্রোণদ্রৌণি কেহ না জানিবে॥
ইহার বিধান এই মম মনে আসে।
এক যাত্রা দুই কার্য্য হইবে বিশেষে॥
কর্ণের এতেক বাণী শুনি সেইক্ষণ
সাধু সাধু প্রশংসা করিল দুর্য্যোধন॥
দুঃশাসন জয়দ্রথ ত্রিগর্ত্ত প্রভৃতি।
সাধু সাধু বলি উঠে যতেক দুর্ম্মতি॥
কর্ণ বলে বিলম্ব না কর কুরুপতি।
সসজ্জ সকল সৈন্য কর শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞামাত্র দুর্য্যোধন হইল বাহির।
ডাকিল সকল সৈন্য সব যোদ্ধা বীর।
যত বন্ধু বান্ধব সহিত পরিবার।
নারীগণ শুনি পাইলা আনন্দ অপার॥
দ্রৌপদী সহিত দেখা দ্বিতীয় উৎসব।
তীর্থস্নান তৃতীয় চিন্তিয়া এই সব॥
বিশেষ সন্তুষ্টা নারী যাত্রামহোৎসবে।
সর্ব্বকাল বন্দিরূপে থাকে বদ্ধভাবে॥
নরযান গোযান তুরঙ্গযান সাজে।
রথ রথী চলিল পদাতি পদব্রজে॥
বাহিনী সাজিছে বহু বাজিছে বাজনা।
সমুদ্রসদৃশ সেনা কে করে গণনা॥
সাজাইয়া সর্ব্ব সৈন্য দুঃশাসন বেগে।
করযোড়ে দাঁড়াইল নৃপতির আগে॥
শুনিয়া কৌরবপতি উঠিল সম্ভ্রমে।
বাহির হইয়া নিরীক্ষয়ে ক্রমে ক্রমে॥
সমুদ্রলহরী যেন রথের পতাকা।
মেঘের সদৃশ হস্তী নাহি যার লেখা॥
মনোহর মনোজ্ঞ উত্তম তুরঙ্গম।
পৃথিবী আচ্ছাদি বীর বিশালবিক্রম॥
সশস্ত্র সকল সৈন্য দেখিতে সুন্দর
শমন সভয় হয় কিবা ছার নর॥
কর্ণ বলে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন
ভীষ্মদেব শুনিলে করিবে নিবারণ॥
এই হেতু তিলেক বিলম্ব না যুয়ায়।
দ্রুতগতি চল সবে এই অভিপ্রায়॥
শুনিয়া কৌরবপতি বিলম্ব না কৈল
গমনসময়ে সব বিদুর জানিল॥
যথা রাজা সৈন্য মাঝে যায় দ্রুতগতি
কহিলা মধুর ভাষে দুর্য্যোধন প্রতি॥
শুন তাত যাইবে প্রভাসতীর্থস্নানে।
পুণ্যকার্য্যে বাধা নাহি করি সে কারণে॥
কুরুবংশশ্রেষ্ঠ তুমি রাজচক্রবর্ত্তী।
পূরিল ভুবন তিন তোমার সুকীর্ত্তি॥
এ সময়ে যত কর ধৈর্য্য আচরণ।
ভূষিত বিভব হবে দ্বিগুণশোভন॥
সবাকার মন মুগ্ধ প্রভাসগমনে।
নিষেধ নাহিক করি আমি সেকারণে॥
বিচিত্র সুচিত্র বন সুন্দর সে স্থল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব তথা নিবসে সকল॥

যত সিদ্ধ ঋষিগণ উপনীত তথা।
তার সনে দ্বন্দ্ব নাহি করিহ সর্ব্বথা॥
দুর্য্যোধনবলে তাত সে আজ্ঞা তোমার।
যদি দ্বন্দ্ব করি তাহে কি ক্ষতি আমার॥
মম সৈন্য দেখ তাত তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্র যম আসে যদি জিনিব বিবাদে॥
তথাচ বিরোধে মম কোন্ প্রয়োজন।
যাও তুমি নিজ গৃহে করহ গমন॥
বিদুরে মেলানি করি কৌরবের পতি।
না করি বিলম্ব আর চলে শীঘ্রগতি॥
বিনা ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণি কৃপাচার্য্য বীর।
সর্ব্ব সৈন্যে দুর্য্যোধন হইলা বাহির॥
চলিতে চরণভরে কম্পিত ধরণী।
ধূলা উড়ি আচ্ছাদিল দিনে দিনমণি॥
সৈন্যকোলাহল জিনি সাগরগর্জ্জন।
প্রমাদ গণিল সবে না বুঝি কারণ॥
নগর ছাড়িয়া বনে করিলা প্রবেশ।
মহাকলরব শব্দে পূরিল বিশেষ॥
মেঘের সদৃশ ধূলি গগনমণ্ডলে।
বহু ক্ষেত্র ভাঙ্গিয়া চলিলা বহুস্থলে॥
ভারতপঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালীপ্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

দুর্য্যোধনের সৈন্য দর্শনে ভীমার্জ্জুনের রণসজ্জা ও যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা।

হেথায় প্রভাতে উঠি ভাই পঞ্চজন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন॥
স্নান হেতু গেলেন সহিত দ্বিজগণ।
ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশেন বন॥
মৃগয়া করিতে যান ভীম ধনঞ্জয়।
রাজার নিকটে রহে মাদ্রীর তনয়॥
মহাবনে প্রবেশ করিলা দুই ভাই।
মারিলেন রাশি রাশি মৃগ এক ঠাঁই॥
অরণ্যভ্রমণে দোঁহে শ্রান্তকলেবর।
বিশ্রাম করেন বসি দুই সহোদর॥
হেনকালে শুনিলা সৈন্যের কোলাহল।
প্রলয়গর্জ্জনে যেন সাগরের জল॥
কটকের পদধূলি ঢাকিল গগণ।
মেঘে আচ্ছাদিল যেন সূর্য্যের কিরণ॥
কহিলা অর্জ্জুন প্রতি পবননন্দন।
চল শীঘ্র মৃগয়াতে নাহি প্রয়োজন॥
শুন ভাই বিপুল সৈন্যের কোলাহল।
পদধূলি আচ্ছাদিত গগনমণ্ডল॥
কৃষ্ণা সহ রহিলেন পাণ্ডবের নাথ।
বিশেষ বালক মাদ্রীপুত্র দুই সাথ॥
কিবা কর্ম্ম করিলাম আসি দুইজনে।
কেবা আসি বিরোধিল ধর্ম্মের নন্দনে॥
এতেক বিচারি শীঘ্র যান দুইজন।
হেথায় মাদ্রীর পুত্র ধর্ম্মের নন্দন॥

সহদেবে আজ্ঞা দেন ধর্ম্ম নৃপমণি।
দেখ ভাই বনে আসে কাহার বাহিনী॥
মৃগয়া করিতে গেল ভীম ধনঞ্জয়।
বিলম্ব দেখিয়া মম আকুল হৃদয়॥
এই বনে বাস করে গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
বিরোধে আসক্ত সদা বীর বৃকোদর॥
কি জানি কাহার সঙ্গে হইল বিরোধ।
বনে কিবা আসিয়াছে কোন মহাযোধ॥
আর এক মম মনে লাগে অভিপ্রায়।
ক্লেশীকৃশ শক্তিহীন দেখিয়া আমায়॥
বনমাঝে থাকি আমি তপস্বীর বেশ।
সহায়সম্পদহীন হীন রাজ্যদেশ॥
দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ শকুনির মন্ত্রণায়।
মন্দমতি দুর্য্যোধন আসিছে হেথায়।
শীঘ্র কহ সহদেব করিয়া নির্ণয়॥
হেনকালে উপনীত ভীম ধনঞ্জয়।
দেখিয়া আনন্দচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
আলিঙ্গিয়া কহিলেন কহ বিবরণ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব নির্ণয় না জানি।
ঘোরশব্দে আসিতেছে কাহার বাহিনী॥
শুনিয়া বিস্মিত বড় হইল হৃদয়।
বিশেষ রাখিয়া একা গেলাম তোমায়॥
ব্যগ্র হয়ে শীঘ্র আইলাম সে কারণে।
ধর্ম্ম বলিলেন ইহা হয়েছিল মনে॥
তোমা দোঁহাজনে দ্বন্দ্ব হৈল কার সনে।
করিতেছিলাম চিন্তা আমি সে কারণে॥
তোমা দোঁহা দেখি গেল সন্দেহ সকল।
কিন্তু ভাই নিকটে সৈন্যের কোলাহল
পরপক্ষ বিপক্ষ সপক্ষ আইল জানি।
অনুমানে জানি ভাই অনেক বাহিনী॥
আজ্ঞামাত্র পার্থ রথ করিতে স্মরণ।
কপিধ্বজযুক্ত রথ দিল দরশন॥
ধর্ম্মেরে প্রণাম করি পার্থ উঠি রথে।
চলিলেন বায়ুবেগে অন্তরীক্ষপথে॥
শব্দ অনুসারে পার্থ পশ্চিমেতে যান।
দেখিলা কৌরবসেনা সমুদ্রপ্রমাণ॥
ধ্বজ ছত্র রথ রথী পদাতি কুঞ্জর।
দেখি জানিলেন পার্থ কৌরব পামর।
এত চিন্তি রথ চালাইয়া শীঘ্রগতি।
মুহূর্ত্তেকে গেলেন যেখানে ধর্ম্মপতি॥
পার্থে দেখি তুষ্ট হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
জিজ্ঞাসেন কার সৈন্য কহ বিবরণ॥
অর্জ্জুন কহেন দেব কি জিজ্ঞাস আর।
দেখিলাম সসৈন্য কৌরবকুলাঙ্গার॥
আমা সবা হিংসিবারে আইলা এখন।
নহে এই বনস্থলে কোন প্রয়োজন॥
এত শুনি মহাক্রুদ্ধ বীর বৃকোদর।
আস্ফালন করি অতি উঠিলা সত্বর॥
করযোড়ে বলিলেন দেখ রাজা ধর্ম্ম।
দেখ মহারাজ দুষ্ট দুর্য্যোধনকর্ম্ম॥
কপটে কপটী সর্ব্ব রাজ্য ধন নিল।
জটা বল্ক পরাইয়া বনে পাঠাইল॥
দেশ হইতে রত্ন ধন কিছু নাহি আনি।
কোন মতে তার বাঞ্ছা না হইল হানি॥
সময়নির্ণয় আমি না করি লঙ্ঘন।
তথাচ আইল দুষ্ট করিতে হিংসন॥

ধর্ম্ম হেতু এত কষ্ট পাই পঞ্চজনে।
সে ধর্ম্ম ফলিল আজি দুষ্ট দুর্য্যোধনে ॥
এতেক এ সৈন্য যদি আসিছে হেথায়।
তবু মনে লাগে ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রায় ॥
প্রসন্ন হইয়া রাজা আজ্ঞা কর মোরে।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিব যতেক সোদরে ॥
উঠ শীঘ্র ধনঞ্জয় বিলম্বে কি কাজ।
এত অপমানেতে তিলেক নাহি লাজ ॥
নিয়ম পূরিতে দিন যে কিছু আছয়।
আমি না লঙ্ঘিনু সেই পাপিষ্ঠ লঙ্ঘয় ॥
হে নকুল সহদেব বীরের প্রধান।
স্ববাঞ্ছিতসিদ্ধি কেন না কর বিধান ॥
এতেক কহিল যদি বৃকোদর বীর।
ক্রোধেতে অবশ হৈল পার্থের শরীর ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল।
মাদ্রীপুত্র দুই জন গর্জ্জিয়া উঠিল ॥
সসজ্জ করিল সবে যার যে বাহন।
তূণ হৈতে বাহির করিলা অস্ত্রগণ ॥
আড়া ভাঙ্গি তূণেতে থুইল পুনর্ব্বার।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দিলেন টঙ্কার ॥
কবচে আবৃত তনু নানা অস্ত্র পৌঁচি।
দেবদত্ত শঙ্খটী বাজান সব্যসাচী ॥
পুনঃ পুনঃ গদা লোফে পবননন্দন।
তখন কহেন ধর্ম্ম মধুর বচন ॥
শুন ভাই কোন্ কর্ম্ম তোমার অসাধ্য।
সহজে অর্জ্জুন এই দেবের অবধ্য ॥
বলে সূর্য্যসম দুই মাদ্রীর তনয়।
ইন্দ্র যম আসে যদি কি তাহে বিস্ময় ॥
কিন্তু অগ্রে কারণ করহ নিরূপণ।
কোন্ কার্য্যহেতু হেথা আসে দুর্য্যোধন ॥
বনেতে ভ্রমণ কিবা তীর্থে করে স্নান।
মৃগয়া করিতে কিবা করিল বিধান ॥
নির্ণয় না জানি অগ্রে কেন কর যুদ্ধ।
নিশ্চয় নহিলে হয় ধর্ম্মপথ রুদ্ধ ॥
যদি অগ্রে তারা হিংসা করয়ে আমার।
আমিহ মারিব তারে নাহিক বিচার ॥
নির্ব্বলের বল ধর্ম্ম তাহে করি হেলা।
দুস্তরসাগরে আর আছে কোন্ ভেলা।
ধর্ম্মপুত্রমুখে শুনি এতেক বচন।
বিরস বদনে নিবর্ত্তিল চারি জন ॥
কূলে নিবারিল যেন সমুদ্রলহরী।
সুসজ্জ বসিল সবে ধর্ম্ম বরাবরি ॥
সম্মুখে বসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
অমরবেষ্টিত যেন দেব আখণ্ডল ॥
মৃগচর্ম্ম কুশাসনে তপস্বীর বেশে।
বল্ক পরিধান শিরে জটাভার কেশে ॥
কথোপকথনে অতি সবার আনন্দ।
হেনকালে আইল দুর্য্যোধন মতিমন্দ ॥
ব্রাহ্মণমণ্ডলী আর ভাই পঞ্চজনা।
দক্ষিণ করিয়া চলে নৃপতির সেনা ॥
অগ্রে চলে অগণিত পদাতিক ঢালী।
মনোরম তুরঙ্গমে সব মহাবলী ॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ তবে মেঘবর্ণ হাতী।
নানা চিত্র বিচিত্র অসংখ্য চলে রথী ॥
হেনকালে কৌরবের যত নারীগণ।
ঘুচাইল রথের বসন আচ্ছাদন ॥

অঙ্গুলীতে দেখাইয়া কহে এই বাণী।
হের দেখ কুটীরেতে দ্রুপদনন্দিনী ॥
বড় ভাগ্যে দেখিলাম কহে সর্ব্বজন।
পাছেপাছে চলে সৈন্য কে করে গণন ॥
শকট বলদ উষ্ট্রে নানা দ্রব্য সারি।
শত মুদিখানা সঙ্গে দোকানি পসারি ॥
যে কিছু বৈভব বৃত্তি রাজার আছিল।
সংহতি সুহৃদ বন্ধু সকলি আনিল ॥
উপমার যোগ্য না হইবে সুসংগতি
বর্ণনা করিতে তাহা কাহার শকতি ॥
এইরূপে যান রাজা কৌরবের পতি।
প্রলয় কালের যেন কলরব অতি ॥
সম্ভাষা করিতে আইল সঞ্জয়নন্দন।
নম্রশিরা শিরে করে ধর্ম্মেরে বন্দন ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কত সমাচার।
কোন্ কর্ম্মে নৃপতি করিলা অগ্রসার ॥
ধর্ম্মবাক্যে কহিলেন সঞ্জয়নন্দন।
প্রভাসে করিতে স্নান আইল রাজন ॥
পুনঃ ধর্ম্ম কহিলেন মুনির আলয়।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ সমুদয় ॥
দেখ তিনি কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ নরপতি।
বিরোধ না হয় যেন কাহার সংহতি ॥
তথা হতে শুনিয়া সঞ্জয়সুত গেল।
ধর্ম্মের যতেক কথা রাজারে কহিল ॥
শুনি অহঙ্কারে অন্ধ অবজ্ঞা করিল।
অবজ্ঞায় দুষ্ট কর্ণ শকুনি হাসিল ॥
সহজে তপস্বী লোকে দেবতার ভয়।
কার শক্তি ক্ষত্রিয় নিকটে অগ্র হয় ॥
এত বলি নিঃশব্দে রহিলা সর্ব্বজনে।
পুণ্যতীর্থ প্রভাস পাইল কতক্ষণে ॥
নানা চিত্র বিচিত্র উদ্যান মনোহর।
প্রফুল্ল কমলবনে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
কোকিল বিহরে নিত্য নিজ মত্ততায়।
মুনির মানস হরে বসন্তের বায় ॥
বিবিধ বনের শোভা কে করে বর্ণন।
দেখিয়া সানন্দচিত্ত রাজা দুর্য্যোধন ॥
দুঃশাসন কর্ণ আদি হরিষ বিধান।
রহিল সকল সৈন্য যথাযোগ্য স্থান।
সারি সারি বস্ত্রগৃহ দেখিতে সুরঙ্গ।
পর্ব্বতসমান যেন পর্ব্বতের ভঙ্গ ॥
বেড়িল বসনে যথা প্রভাসের বারি।
কৌতুকবিধানে স্নান করে সব নারী ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা সহোদর শত।
ত্রিগর্ত্ত শকুনি কর্ণ অমাত্য আবৃত ॥
স্নান করি কৌতুকে করিয়া নানা দান।
হয় হস্তী গাভীগণ নাহি পরিমাণ ॥
পরম কৌতুকে সবে স্নানদান করি।
বিচিত্র বসন নানা অলঙ্কার পরি ॥
জলপান করিয়া বসিল সর্ব্বজন।
কৌতুকে বসিয়া করে তাম্বুল চর্ব্বণ ॥
আলস্য ত্যজিয়া কেহ করিল শয়ন।
কেহ পাশা খেলে কেহ করয়ে রন্ধন ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস ॥

দুর্য্যোধনের সৈন্যের সহিত চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধ।

এই মতে রহে সৈন্য যুড়ি বনস্থল।
গতায়াতে লণ্ডভণ্ড উদ্যান সকল॥
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটনে।
গন্ধর্ব্ব উদ্যান এক ছিল সেই বনে॥
চিত্রসেন নাম তার গন্ধর্ব্ব প্রধান।
যার নামে সুরাসুর সদা কম্পমান॥
তাহার কিঙ্কর ছিল বনের রক্ষক।
দেখিল উদ্যান ভাঙ্গে রাজার কটক॥
বহু সৈন্য দেখি একা না করি বিরোধ।
দুর্য্যোধন অগ্রে আসি কহিছে সক্রোধ॥
শুন রাজা মম বাক্যে কর অবগতি।
প্রভু মম চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের পতি॥
কুসুম-উদ্যান তাঁর এই বনে ছিল।
প্রবেশি তোমার সৈন্য সকল ভাঙ্গিল॥
বনের রক্ষক আমি কিঙ্কর তাঁহার।
না করিলা ভাল কর্ম্ম কি কহিব আর॥
এই কথা মম মুখে পাইবে সংবাদ।
আসিয়া ইঙ্গিতে রাজা করিবে প্রমাদ॥
এত শুনি মহাক্রোধে কহে বীর কর্ণ।
বিকচকমলপ্রায় চক্ষু রক্তবর্ণ॥
ওরে দুষ্ট করিস কাহার অহঙ্কার।
কোন্ ছার গন্ধর্ব্ব এতেক গর্ব্ব তার॥
যে কথা কহিলি তুই আসি মোর কাছে।
এতক্ষণ জীবে কে এমত কেবা আছে॥
সহজে অত্যল্পবুদ্ধি দ্বিতীয় নফর।
যাহ শীঘ্র আন গিয়া আপন ঈশ্বর॥

বলাবল বুঝিব সাক্ষাৎ যুদ্ধকালে।
কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভাল ভালে॥
এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল।
মহা দুঃখ মনে পথে কান্দিয়া চলিল॥
বসিয়া গন্ধর্ব্বেশ্বর আপন আবাসে।
হেনকালে অনুচর কহে মৃদুভাষে॥
রক্ষাহেতু তুমি মোরে রাখিলা উদ্যানে।
দুর্য্যোধন রাজা আসি প্রভাসের স্থানে॥
তার সৈন্য উদ্যান করিল লণ্ডভণ্ড।
রাজারে কহিনু গিয়া তার এই দণ্ড॥
যতেক কুৎসিত ভাষা কহিল তোমারে।
দুর্য্যোধন সেনাপতি কর্ণ নাম ধরে॥
মনুষ্য হইয়া করে এত অহঙ্কার।
দোষমত দণ্ড যদি না দিবা তাহার॥
এইমত দুষ্টাচার করিবেক সবে।
লঘু গুরু মনুষ্য দেবেতে কিবা তবে॥
...
কোন্ ছার মনুষ্য করিব চূর্ণ গর্ব্ব॥
মরণকালেতে পিপড়ার পাখা উঠে।
যাইতে করিল বাঞ্ছা শমন নিকটে॥
ক্রোধভরে রথারোহী চলে দ্রুতগতি।
ধনুকটঙ্কার শুনি কম্পমান ক্ষিতি॥
দিব্য বাণ শাণিত পূরিয়া যুগ্ম তূণ।
ক্রোধভরে আসিতেছে জ্বলন্ত আগুন॥
কত দূরে গিয়া দেখে রথের পতাকা।
শূন্য পথে আসে যেন জ্বলন্ত উলকা॥

কুরুসৈন্য নিকটে আইল সেইক্ষণ।
কাহতে লাগিল অতি গভীর গর্জ্জন ॥
আরে দুষ্ট ত্যজ আজি জীবনের সাধ
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে বিবাদ ॥
এতেক বলিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে কৈল অন্ধকার ॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্বগর্ব্ব কর্ণে হৈল ক্রোধ
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ যায় মহাযোধ ॥
সূর্য্য-অস্ত্র যুড়িলেন সূর্য্যের নন্দন।
কাটিয়া সকল অস্ত্র কৈল নিবারণ ॥
তবেত গন্ধর্ব্ব এড়ে তীক্ষ্ণ পঞ্চ বাণ।
অর্দ্ধপথে কর্ণবাণে হৈল দশখান ॥
গন্ধর্ব্ব দেখিল অস্ত্র কাটিলেক কর্ণ।
ক্রোধে কম্পমান তনু চক্ষু রক্তবর্ণ ॥
হংসমুখ দিব্য অস্ত্র যুড়িল ধনুকে।
অস্ত্রে অগ্নি বাহিরয়ি ঝলকে ঝলকে।
মহাবীর কর্ণ তবে অপূর্ব্ব সন্ধানে।
কাটিলা গন্ধর্ব্ব অস্ত্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ॥
সর্পবাণ গন্ধর্ব্ব যুড়িল সেইক্ষণ।
যুড়িল গরুড় বাণ সূর্য্যের নন্দন ॥
তবে কর্ণ দিব্য ভল্ল মন্ত্রে অভিষেকি।
কহিল গন্ধর্ব্ব অগ্রে কর্ণ বীর ডাকি ॥
অরে দুষ্ট অহঙ্কারে না দেখ নয়নে।
গন্ধর্ব্ব হইলি চূর্ণ পড়ি মম বাণে ॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ কৈল বিসর্জ্জন।
উঠিয়া আকাশপথে করিল গর্জ্জন ॥
অস্ত্র দেখি ব্যস্ত হৈয়া গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
শীঘ্রহস্তে এড়ে বীর চোখ চোখ শর ॥
দুই অস্ত্রে মহাযুদ্ধ হইল অম্বরে।
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে ॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কর্ণ সক্রোধ অন্তর।
চিত্রসেনে প্রহারিল শতেক তোমর ॥
বাণাঘাতে ব্যগ্র হয়ে গন্ধর্ব্বের পতি।
ডাকিয়া বলিল তবে কর্ণ বীর প্রতি ॥
ধন্য তোর বীরপণা ধন্য তোর শিক্ষা।
এখন বুঝহ তুমি আমার পরীক্ষা ॥
এতেক বলিয়া প্রহারিলা দশ বাণ।
ব্যথায় ব্যথিত কর্ণ হইল অজ্ঞান ॥
কতক্ষণে চেতন পাইল মহাবল।
বেড়িল গন্ধর্ব্বে আসি কৌরব সকল ॥
শতপুর করিয়া বেড়িল সর্ব্বসেনা।
ধনুকটঙ্কার যেন সঘন ঝঞ্ঝনা ॥
দশদিক যুড়িয়া করিল অন্ধকার।
গন্ধর্ব্ব সবার অস্ত্র করিল সংহার ॥
প্রাণপণে সবে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
সবে নিবারণ করে গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ॥
পরশুরামের শিষ্য কর্ণ মহাবীর।
অচল পর্ব্বত যেন যুদ্ধে হৈল স্থির ॥
রাখিয়া আপন সেনা আপন বিক্রমে।
প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিলা বহুশ্রমে ॥
তবেত গন্ধর্ব্ব মনে করিল বিচার।
জানিল কৌরবসেনা রণে অনিবার ॥
মায়া বিনা এ সকল নারিব জিনিতে।
মায়ার পুত্তলি এত বিচারিল চিত্তে ॥
রথ লুকাইল তবে নাহি দেখি আর।
অন্তর্দ্ধান হইয়া করিল অন্ধকার ॥

অন্তরীক্ষে পড়ে বাণ দেখি সর্ব্বজনে।
অ'চ্ছিদ্রে বরিষে যেন ধারায় শ্রাবণে॥
কোথায় গন্ধর্ব্ব আছে কেহ নাহি দেখে
বৃষ্টি হেন শত অস্ত্র পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
মুখে মাত্র মার মার শুনি সবাকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
হয় হস্তী রথ রথী কে করে অবধি॥
কতক্ষণ রণ সহি ছিল কর্ণ বীর।
তাহার সহিত কিছু সৈন্য ছিল স্থির॥
শূন্য তূণ ছিন্ন গুণ অঙ্গে জলশ্রম।
বিষণ্ণবদন সবে হয় মনোভ্রম॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল কর্ণ বীর।
পলায় কৌরবসেনা ভয়েতে অস্থির॥
অম্বরে সম্বরে নাহি নাহি বান্ধে কেশ।
পলায় সকল সৈন্য পাগলের বেশ॥
বেগে ধায় পশ্চাতে না চায় কোন জন।
স্ত্রীগণ রক্ষক মাত্র রাজা দুর্য্যোধন॥
কতক্ষণ সহে যুদ্ধ প্রাণ ব্যগ্র তায়।
হেনকালে চিত্রসেন আইল তথায়॥
দুর্য্যোধনে ডাকি বলে পরিহাস-বাণী।
গগনে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী॥
আরে মন্দমতি দুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বচালন॥
কোথা তোর সে বন্ধু সহায় সমুদিত।
একেলা ছাড়িয়া কেন স্ত্রীগণ সহিত॥
এই অহঙ্কারে নাহি দেখহ নয়নে।
আজিকার রণে যাবি শমনসদনে॥
ভারতপঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালীপ্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধে জয় এবং নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের বন্ধন।

কর্ণ ভঙ্গ দিল রণে, আকুল গন্ধর্ব্ববাণে,
পলায় সকল সেনাপতি।
পলায় ত্রিগর্ত্তনাথ, সৌবল শকুনি সাথ,
কর্ণ দুঃশাসন বিবিংশতি॥
যত যত মহাবীর, রণেতে নহিল স্থির,
প্রমাদ গণিয়া সর্ব্বজন।
কে করে তাহার লেখা, কেবল রাখিয়া একা,
নারীবৃন্দ সহ দুর্য্যোধন॥
মহাত্রস্ত হয়ে যায়, নারী পানে নাহি চায়,
রথ চালাইয়া দ্রুতগতি।

অশ্ব গজ ধায় রড়ে, পদেতে পদাতি পড়ে,
উঠে হেন নাহিক শকতি ॥
হেন মতে সৈন্য সব, করি মহাকলরব,
প্রাণ লয়ে পলায় তরাসে।
প্রতিশব্দে কোলাহল, পূর্ণ হৈল বনস্থল,
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি হাসে ॥
তবে দুর্য্যোধনে কয়, দুষ্টবুদ্ধি পাপাশয়,
না জানিস গন্ধর্ব্ব কেমন।
আরে মন্দমতিমান, ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান,
অহঙ্কারে করিস হেলন ॥
না জানিস নিজ বল, এখন উচিত ফল,
মম হস্তে অবশ্য পাইবে।
লইব রে তোর প্রাণ, ইহাতে নাহিক আন,
মনের মানস পূর্ণ হবে ॥
এত বলি নিজ অস্ত্র, যুড়িলেক লঘুহস্ত,
গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর ক্রোধমনে।
অবশ্য জানয়ে সন্ধি, এবে সে করিল বন্দী,
ধরিলেক রাজা দুর্য্যোধনে ॥
বন্দী হৈল কুরুশ্রেষ্ঠ, সপক্ষ দিলেক পৃষ্ঠ,
দোসর নাহিক আর সাথে।
স্ত্রীবৃন্দ সহিত রাজা, রথে তুলি মহাতেজা,
দ্রুতগতি যায় স্বর্গপথে ॥
ঘোর আর্ত্তনাদ করি, কান্দয়ে সকল নারী,
হায় হায় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কপালে কঙ্কণাঘাত, ঘন ডাকে জগন্নাথ,
পার কর বিপদসাগরে ॥
আমি সর্ব্বধর্ম্মহীন, পাপকর্ম্ম প্রতিদিন,
তব ভক্তি লেশ নাহি মনে।

সত্য আমি হীনতপা, কেবল করহ কৃপা,
দীনবন্ধু নামের কারণে ॥
ইত্যাদি অনেক করি, স্তুতি করে কুলনারী,
কেহ নিন্দা করে নিজপতি।
দুষ্টবুদ্ধি স্বামিগণ, ধর্ম্মহিংসা অনুক্ষণ,
সে কারণে হৈল অধোগতি ॥
কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপতি, ধর্ম্মেতে যাঁহার মতি,
অনুগত ভাই চারি জন।
কেবল ধর্ম্মের সেতু, প্রাণ ত্যজে ধর্ম্ম হেতু,
তাঁরে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা, দেব-দ্বিজ-অনুগতা,
সতত ধর্ম্মেতে যাঁর মতি।
লক্ষ্মী-অংশ যাজ্ঞসেনী, সভামধ্যে তাঁরে আনি,
চুলে ধরি করিল দুর্গতি ॥
সে ধর্ম্ম ফলিল আজি, বিপদসাগরে মজি,
সবাই হারানু জাতি কুল।
বার্ত্তা পায়ে ধর্ম্মরাজ, জানিয়া কুলের লাজ,
কেবল রক্ষার মাত্র মূল ॥
তবে দুর্য্যোধননারী, এই যুক্তি মনে করি,
অনুচরে কহে শীঘ্রগতি।
বিলম্ব না কর তাত, যথা পাণ্ডবের নাথ,
কহ গিয়া সকল দুর্গতি ॥
কহিবা বিনয় করি, মোসবার নাম ধরি,
নিশ্চয় মজিল কুরুবংশ।
মোসবার কর্ম্মফলে, এ কুৎসাকলঙ্ক কুলে,
চিত্রসেনহস্তে জাতিধ্বংস ॥
অনুচর কহে বাণী, সত্য কহ ঠাকুরাণী,
পাসরিলে পূর্ব্বকথা সব।

যে কর্ম্ম করিয়া তাঁরে, পাঠাইলা বনান্তরে,
তাঁহা বিনা কে আছে বান্ধব ॥
যে আজ্ঞা তোমার মাতা, এখনি যাইব তথা,
কহিব সকল সমাচার।
ধর্ম্মরাজ মহাশয়, ধীর বটে ধনঞ্জয়,
ভীমহস্তে নাহিক নিস্তার ॥
রাণী বলে ধর্ম্মরাজ, জানিয়া কুলের লাজ,
আমা সবার আপদভঞ্জনে।
না করিয়া ভেদমতি, পরদুঃখে দুঃখী অতি,
উদ্ধারিবে পাঠায়ে অর্জ্জুনে ॥
স্বামী মম অপরাধী, ইহাতে অবজ্ঞা যদি,
করিয়া উদ্ধার না করিবে।
মেলিয়া সকল নারী, বিষ অগ্নি ভর করি,
কিবা জলে প্রবেশি মরিবে ॥
এত শুনি শীঘ্র দূত, গেল যথা ধর্ম্মসুত,
মাদ্রীর তনয় ভীমার্জ্জুন।
বেষ্টিত ব্রাহ্মণ ভাগে, কর যোড় করি আগে,
কহিতে লাগিল সকরুণ ॥
অবধান মহারাজ, দৈবের দুর্গতি আজ,
রাজা আইল প্রভাসের স্নানে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম, খণ্ডন না যায় ধর্ম্ম,
বন্ধ হৈল চিত্রসেন বাণে ॥
গন্ধর্ব্বের মায়াবলে, পোড়াইল অস্ত্রানলে,
প্রাণেতে কাতর যত সেনা।
কর্ণ শাল্ব দুঃশাসন, যত মহাযোধগণ,
প্রাণ লয়ে যায় সর্ব্বজনা ॥
একা ছিল দুর্য্যোধন, রক্ষা হেতু নারীগণ,
প্রাণপণে যুঝিল রাজন।

যতেক নারীর সহ, করাইয়া রথারোহ,
লয়ে যায় করিয়া বন্ধন ॥
প্রতীকারে নহে দক্ষ, পৃষ্ঠে ভঙ্গ দিল পক্ষ,
শেষে যায় জাতি কুল প্রাণ।
আকুল হইয়া মনে, তব ভ্রাতৃবধূগণে,
পাঠাইয়া দিল তব স্থান ॥
আর বা কি কব আমি, আজন্ম আমার স্বামী,
অপরাধী তোমার চরণে।
কুলের কলঙ্কোদয়, ভয়ার্ত্ত জনার ভয়,
দূর কর আপনার গুণে ॥
ইহা সবাকার দোষে, যদি এই অভিরোষে,
উদ্ধার না কর ধর্ম্মপতি।
হইবা বধের ভাগী, জীব বা কিসের লাগি,
অনল গরল জলে গতি ॥
তোমার কুলের নারী, গন্ধর্ব্ব লইয়া হরি,
যাবৎ না যায় অতি দূর।
দেখিয়া উচিত কর্ম্ম, করহ কুলের ধর্ম্ম,
রক্ষা কর কুলের ঠাকুর ॥
শুনিয়া চরের কথা, মর্ম্মে পাইলেন ব্যথা,
ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
কুলের কলঙ্ক আর, ভয়ান্বিত অবলার,
রক্ষা হেতু হইলা অস্থির ॥
বিষম নিগ্রহ জানি, বিচারিয়া ধর্ম্মমণি,
অর্জ্জুনেরে কহেন বিশেষ।
শীঘ্র আন দুর্য্যোধনে, কহি চিত্রসেন স্থানে,
যাবৎ না যায় নিজ দেশ ॥
বিনয়পূর্ব্বক তথা, কহিবে মধুর কথা,
বহুবিধ আমার বিনয়।
যদি তাহে সাধ্য নহে, দ্বৈপায়ন দাস কহে,
দণ্ড দিবে উচিত যা হয় ॥

———•———

ধর্ম্মাজ্ঞায় ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধে যাত্রা ও নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের মুক্তি।

যুধিষ্ঠির বলিলেন যাহ শীঘ্রগতি।
গন্ধর্ব্ব না যায় যেন আপন বসতি॥
ছাড়াইয়া আন গিয়া প্রধান কৌরবে।
প্রণয়পূর্ব্বক হৈলে দ্বন্দ্ব না করিবে॥
এত যদি কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
গর্জ্জিয়া উঠিল ভীম অর্জ্জুন সুমতি॥
ধন্য মহাশয় তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
এখনও ঈদৃশ বুদ্ধি! অদৃষ্ট আমার॥
আমা সবাকারে দুষ্ট যতেক করিল।
কাল পায়ে সেই বৃক্ষ এখন ফলিল॥
অহর্নিশি জাগে সেই মনেতে অনিষ্ট।
গন্ধর্ব্বে করিল তাহা ঘুচিল অরিষ্ট॥
অধর্ম্মে বাড়ায় রাজা অধর্ম্মীর সুখ।
তাহা দেখি নিত্য পাই পরম কৌতুক॥
ক্রমে ক্রমে সকল সংসার করে জয়।
কাল পেলে মূলের সহিত নষ্ট হয়॥
যত গর্ব্ব করিল কৌরব দুরাশয়।
নিঃশত্রু হইল রাজ্য চল নিজালয়॥
এতেক কহেন যদি ভাই দুইজন।
মনেতে চিন্তেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
বিনা ক্রোধে কার্য্যসিদ্ধি না হয় নিশ্চয়।
তবে ধর্ম্ম কহেন সম্বোধি ধনঞ্জয়॥
কহিলা যতেক পার্থ অন্যথা না করি।
সে মম পরম শত্রু আমি তার বৈরী॥
আত্মপক্ষে ঘরে দ্বন্দ্ব করিব যখন।
তারা শত সোদর আমরা পঞ্চজন॥
সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত।
তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত॥
একারণে কহি ভাই করিতে উদ্ধার।
পূর্ব্বাপর আছে ভাই নীতি বিধাতার।
আর এক কথা শুন বিচারিয়া মনে।
যদি না আনিবা তুমি রাজা দুর্য্যোধনে॥
দুষ্টবুদ্ধি অতিশয় রাজা চিত্রসেনে।
পশ্চাতে হইবে তার অহঙ্কার মনে॥
লইবেক দুর্য্যোধনে সহ নারীবৃন্দ।
অমরমণ্ডলী তথা আছয়ে সুরেন্দ্র॥
সবাকার অগ্রে কহিবেক সমাচার।
জানিবে কৌরবসেনা রণে অনিবার॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চজন তথায় আছিল।
যত মম পরাক্রম সকলি দেখিল॥
তাহার কুলের বধূ সহ দুর্য্যোধনে।
বান্ধিয়া আনিনু দেখিলেক সর্ব্বজনে॥
বারণ করিতে শক্তি নহিল কাহার।
কহিবে ইন্দ্রের অগ্রে এই সমাচার॥
শুনিয়া হাসিবে যত অমরসমাজ।
অবজ্ঞা করিবে তোমা ইন্দ্র দেবরাজ॥
তুমি যে অবজ্ঞা কর ভাবিয়া বিপক্ষ।
দেবতা জানিবা তুমি বলেতে অদক্ষ॥
আনিতে বলিনু আমি ইহা মনে করি।
নহে দুর্য্যোধন মম কোন উপকারী॥
শুনিয়া উঠিল কোপে বীর ধনঞ্জয়।
এমত কহিবে দুষ্টবুদ্ধি পাপাশয়॥

এই দেখ মহাশয় তোমার প্রসাদে।
না জীবে গন্ধর্ব্ব আজি পড়িল প্রমাদে॥
এত বলি মহাক্রোধে উঠিয়া অর্জ্জুন।
গাণ্ডীব নিলেন হস্তে বান্ধি যুগ্ম তূণ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি।
রথে গিয়া চড়িলেন শ্রীগোবিন্দ বলি॥
পবন গমন জিনি চলে স্বর্গপথ।
ক্ষণে উত্তরিল যথা চিত্রসেনরথ॥
পাছে যান ধনঞ্জয় ফিরিয়া নেহালি।
দ্রুতগতি রথ চালাইল মহাবলী॥
তবে পার্থ মনে মনে করেন বিচার।
ভয়যুক্ত পলায় গন্ধর্ব্ব কুলাঙ্গার॥
অতিবেগে ধায় রথ যাবে স্বর্গমাঝে।
বিদিত হইবে তবে দেবতাসমাজে॥
ইহা জানি শরজালে রোধিলেন পথ।
ফাঁফর গন্ধর্ব্বপতি না চলিল রথ॥
চতুর্দ্দিকে ফিরিয়া যাইতে নহে দক্ষ।
পিঞ্জরের মধ্যে যেন রহে পোষা পক্ষ
সেইক্ষণে উপনীত বীর ধনঞ্জয়।
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি কহে সবিনয়॥
কহ পার্থ কোন্ হেতু আইলে হেথায়।
দুর্য্যোধন উপকারে আসিতেছ প্রায়॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় হইতেছে মনে।
আজন্ম করিল হিংসা তোমা পঞ্চজনে॥
কহিতে না পারি পূর্ব্বে আর যত ক্লেশ।
সম্প্রতি দেখি যে বনে তপস্বীর বেশ॥
তাহার উচিত ফল পাও দৈববশে।
পথ ছাড় শীঘ্রগতি যাই নিজ বাসে॥
পার্থ বলিলেন জ্ঞান নাহিক তোমায়।
কহিলে যতেক কথা পাগলের প্রায়॥
আপনা আপনি লোক যত দ্বন্দ্ব করে।
আত্মপক্ষ কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে॥
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিস অজ্ঞান।
আমা সবা অভেদ করিয়া তুই জান॥
যুধিষ্ঠির তুল্য মম ভাই দুর্য্যোধন।
তাহারে লইয়া যাবি করিয়া বন্ধন॥
এই কুলবধূগণে তুমি লয়ে যাবে।
লোকেতে হইবে কুৎসা কলঙ্ক রটিবে॥
কুলের কুৎসায় সুখী কুলাঙ্গার জন।
কি মতে সহিবে তাহা আমার এ মন॥
এই হেতু শীঘ্রগতি আইনু হেথায়।
ছাড় দুর্য্যোধনে নহে যাবে যমালয়॥
করহ সকলে মুক্ত নহে ফল দিব।
মুহূর্ত্তেকে শমনসদনে পাঠাইব॥
চিত্রসেন বলে তোর জানিলাম মতি।
বুঝিয়া করিল বিধি এতেক দুর্গতি॥
মরিতে বাসনা তব হইল নিশ্চয়।
দুই ভাই একত্রে যাইবা যমালয়॥
এত বলি দিল শীঘ্র ধনুকে টঙ্কার।
দশদিক বাণেতে হইল অন্ধকার॥
দেখি পার্থ হইলেন জ্বলন্ত অনল।
নিমিষের মধ্যে কাটিলেন সে সকল॥
দোঁহার বিচিত্র শিক্ষা দোঁহে লঘুহস্ত।
বৃষ্টিবৎ শত শত পড়ে কত অস্ত্র॥
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে।
জ্বলন্ত উলকা প্রায় উঠয়ে অম্বরে॥

হইল দোঁহার অঙ্গ শরেতে জর্জ্জর।
ভ্রুভঙ্গ তিলেক নাহি দোঁহে ধনুর্দ্ধর॥
গন্ধর্ব্ব আপন মায়া করিল প্রকাশ।
সন্ধান পূরিয়া অস্ত্র এড়িলেন পাশ॥
দিব্য অস্ত্র এড়ি পার্থ করি নিবারণ।
দশ অস্ত্র অঙ্গে তার করেন পাতন॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষসের দীক্ষা।
নরেতে নাহিক তুল্য অর্জ্জুনের শিক্ষা।
যে বাণেতে গন্ধর্ব্ব বান্ধিল দুর্য্যোধনে
সেই বাণ অর্জ্জুন যুড়িল ধনুগুণে॥
বান্ধিয়া গন্ধর্ব্বগণা ভৃত্যের সহিত।
নিজ রথে চড়াইয়া চলেন ত্বরিত॥
দুর্য্যোধন নারী সহ গন্ধর্ব্বের পতি।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত ধর্ম্মের বসতি॥
সমর্পিয়া সকল করেন নিবেদন।
যে রূপে গন্ধর্ব্বপতি করিলেক রণ॥
যুধিষ্ঠির খুলিলেন দোঁহার বন্ধন।
পার্থে অনুযোগ করিলেন অগণন॥
এই চিত্রসেন জান গন্ধর্ব্বের পতি।
ইহাকে উচিত নহে এতেক দুর্গতি॥
চিত্রসেনে বলেন যে তুমি মতিমন্ত।
চালন করহ কেন ক্ষাত্রেয় দুরন্ত॥
বালক অর্জ্জুন করিলেক অপরাধ।
চাহিয়া আমার মুখ করহ প্রসাদ॥
না কহিবা ইন্দ্রকে এ সব অপমান।
যাও দ্রুত নিজালয়ে করহ প্রয়াণ॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্বপতি আনন্দিত মনে।
আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিলা সেইক্ষণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাণ॥

দুর্য্যোধনের সপরিবারে স্বস্থানে যাত্রা।

গন্ধর্ব্ববিদায় হয়ে গেল নিজ ধাম।
দুর্য্যোধন আসি ধর্ম্মে করিল প্রণাম॥
বসিল মলিন মুখে হয়ে নম্রশির।
মধুর বচনে কহিলেন যুধিষ্ঠির॥
শুন ভাই হেন কর্ম্ম না করিহ আর।
পৌরুষ নাহিক ইথে আমা সবাকার॥
বিশেষে বৈভবকালে ধর্ম্ম আচরণ।
ধন হৈলে নাহি করে ধর্ম্মের হেলন॥
কহিলেন এইমত বহু নীতিবাণী।
অগ্রসরি স্ত্রীগণে আনিল যাজ্ঞসেনী॥
দ্রৌপদীরে প্রণাম করিল নারীগণ।
যতেক দুঃখের কথা কৈল নিবেদন॥
দুস্তর সাগর মাঝে ডুবিল তরণি।
নিজ গুণে উদ্ধার করিলা ধর্ম্মমণি॥
বুঝিলাম কুরুবংশ রক্ষার কারণে।
নিবসতি তোমরা করিলা এই বনে॥
তবে কৃষ্ণা সবাকারে করিল সম্মান।
ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া দিল দিব্য অন্ন পান॥
একত্র হইল তবে যত সৈন্যগণ।
পরম কৌতুকে সবে করিল ভোজন॥
মহামানী দুর্য্যোধন মলিন বদনে।
বিদায় হইয়া চলে ধর্ম্মের চরণে॥
মধুর সম্ভাষে রাজা করিয়া বিদায়।
অগ্রসরি কত দূর যান ধর্ম্মরায়॥

দ্রুতগামী সকল চলিল সেনাগণ।
বিরস বদনে যায় রাজা দুর্য্যোধন ॥
নগরে যাইবা মাত্র আছে কত পথ।
সেই স্থানে দুর্য্যোধন রাখাইল রথ ॥
মাতুল শকুনি আর কর্ণ দুঃশাসনে।
সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলা দুঃখমনে ॥
স্বসৈন্য সহিত দেশে যাও সর্ব্বজন।
নিশ্চয় কহিনু আমি ত্যজিব জীবন ॥
পূর্ব্বে নাহি বুঝিলাম আপনার বল।
সমুচিত বিধাতা দিলেক তার ফল ॥
পূর্ব্বে যদি এ সকল কহিতে হে সবে।
যুধিষ্ঠির সহ কেন বিরোধ হইবে ॥
ভীমার্জ্জুন হইতে আমারে স্নেহ অতি।
স্বচ্ছন্দে পালিত মোরে ধর্ম্ম নরপতি ॥
ভ্রাতৃভেদ করাইলা করিয়া আশ্বাস।
আমি মন্দমতি তাহে করিনু বিশ্বাস ॥
অনুক্ষণ কহ সবে মারিব পাণ্ডব।
চক্ষু কর্ণে বিবাদ ঘুচিল আজি সব ॥
পলাইলা সবে মোরে রাখি যুদ্ধভূমে।
বান্ধিয়া লইতেছিল গন্ধর্ব্ব আশ্রমে ॥
আর দেখ অপরূপ রহস্য বিধির।
আজন্ম হিংসিনু আমি রাজা যুধিষ্ঠির ॥
উদ্ধার করিল সেই আমা হেন জনে।
মরণ অধিক লাজ মস্তকমুণ্ডনে ॥
চিত্রসেনহস্তে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শতগুণে।
অযশ উদ্ধার মম করিল অর্জ্জুনে ॥
কোন লাজে লোক মাঝে দেখাব বদন।
নিশ্চয় না যাব দেশে এই নিরূপণ ॥
তবে কর্ণ মহাবীর দেখিয়া অশক্য।
কহিতে লাগিল যে রাজার হিত পক্ষ ॥
শুন রাজা কি হেতু চিন্তহ অকারণ।
জয় পরাজয় যত দৈবের ঘটন ॥
ইন্দ্র দেবরাজ হয় অমর-ঈশ্বর।
সদাকাল দেখ তার দানবের ডর ॥
কতবার স্বর্গভ্রষ্ট করাইল তাঁরে।
পুনর্ব্বার পায় রাজ্য উপায় প্রকারে ॥
পূর্ব্বাপর হেন নীতি বিধির আছয়।
কখন বা জয় যুদ্ধে কভু পরাজয় ॥
কহিলা যে যুধিষ্ঠির উদ্ধার কারণ।
আপনার অধর্ম্ম জানিয়া প্রবর্ত্তন ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অধর্ম্মের ভয়ে।
এ কারণে পাঠাইল বীর ধনঞ্জয়ে ॥
সৈন্য হেতু সেনাপতি জয় করে জন।
পূর্ব্বাপর এইমত বিধির ঘটন ॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি সবাকার আগে।
মহাবীর ধনঞ্জয় হৈল মম ভাগে ॥
তব হস্তে ভীমসেন না ধরিবে টান।
আর জনে সংহারিব পতঙ্গ সমান ॥
পরাজয় হেতু রাজা কর অভিমান।
সংক্ষেপে তাহার কহি শুন সাবধান ॥
অন্য শত্রু দেখি রাজা তৃণের সমান।
সবাকে অধিক রাজা দৈব বলবান ॥
দৈব রণ বুঝি ক্ষমা করিলাম সবে।
মনুষ্য হইলে বলি অপমান তবে ॥
এতেক বলিল যদি সূর্য্যের নন্দন।
তথাপিহ মৌনেতে রহিল দুর্য্যোধন ॥

হেনকালে মিলি দৈত্য দানব সকল।
দুর্য্যোধনদুঃখে কহে হইয়া বিকল ॥
আমাদের বংশে জন্ম হইল ইহার।
তেঁই সে ইহার দুঃখে দুঃখ সবাকার ॥
আশ্বাস করিয়া সবে বলে শূন্যবাণী।
ঘরে যাও ওহে রাজা কর্ণকথা শুনি ॥
যাও কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা আপন আশ্রয়।
কর্ণের প্রতিজ্ঞা রাজা কভু মিথ্যা নয় ॥
যুদ্ধপরাজয় হেতু না করিহ মনে।
দেবতা মনুষ্যে যুদ্ধ ভঙ্গ সে কারণে ॥
এত শুনি উঠিলেন কৌরবের পতি।
সসৈন্যেতে নিজালয় যান দ্রুতগতি ॥
পাইল এ সব বার্ত্তা ভীষ্ম মহাবল।
ধৃতরাষ্ট্র আগে গিয়া কহিল সকল ॥
শুন রাজা তোমার পুত্রের বিবরণ।
যে কারণে বিলম্ব হইল এতক্ষণ ॥
যথায় কাম্যক বন প্রভাসের তীর।
পঞ্চ সহোদর যথা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ শকুনির দুষ্টপণে।
দেখাইতে বৈভব গেলেন সর্ব্বজনে ॥
চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব সহিত যুদ্ধ হৈল।
সসৈন্য শকুনি কর্ণ দূরে পলাইল ॥
নারীবৃন্দ সহিত ধরিয়া দুর্য্যোধন।
গন্ধর্ব্ব লইতেছিল করিয়া বন্ধন ॥
দয়ার সাগর অতি ধর্ম্মের তনয়।
উদ্ধারিতে পাঠাইল বীর ধনঞ্জয় ॥
এখন এরূপ যার ধর্ম্ম আচরণ।
ইহার সর্ব্বত্র জয় জানিহ রাজন ॥
শুনিয়া অন্ধের হৈল বিচলিত মন ॥
বহুমতে নিন্দিল আপন পুত্রগণ ॥
ভারতপঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস ॥

কাশীরাম দাস।

রামায়ণ।

শ্রীরামের গঙ্গাস্নান ও গুহকের সহিত মিতালি এবং ভরদ্বাজ মুনির গৃহে শ্রীরামের অক্ষয় ধনুর্ব্বাণপ্রাপ্তি।

এক দিন দশরথ পুণ্যতীর্থ পায়ে।
গঙ্গাস্নানে যান রাজা চারিপুত্র লয়ে॥
হইবেক অমাবস্যা তিথিতে গ্রহণ।
রামের কল্যাণে রাজা দিলেন কাঞ্চন॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ চলে সঙ্গে শতে শতে।
চারিপুত্র সহ রাজা চাপিলেন রথে॥
চলিল কটক সব নাহি দিশপাশ।
কটকের শব্দে পূর্ণ হইল আকাশ॥
চলিলেন দশরথ চড়ি দিব্য রথে।
নারদ মুনির সঙ্গে দেখা হয় পথে॥
মুনি বলে কোথা রাজা করেছ প্রয়াণ।
ভূপতি কহেন গিয়া করি গঙ্গাস্নান॥
মুনি বলে দশরথ তুমি ত অজ্ঞান।
রামমুখ দেখিলে কে করে গঙ্গাস্নান॥
পতিতপাবনী গঙ্গা পৃথিবীমণ্ডলে।
সেই গঙ্গা জন্মিলেন যার পদতলে॥
সেই দান সেই পুণ্য সেই গঙ্গাস্নান।
পুত্রভাবে দেখ তুমি প্রভু ভগবান্॥

এত যদি নৃপতিরে কহিলেন মুনি।
রাজা বলে চল ঘরে রাম রঘুমণি॥
বাপের বচন শুনি বলেন শ্রীরাম।
অনেক পাষণ্ড আছে ধর্ম্মপথে বাম॥
গঙ্গার মহিমা আমি কি বলিতে জানি।
না শুনহ মহারাজ নারদের বাণী॥
এত যদি বলিলেন কৌশল্যাকুমার।
চলিলেন দশরথ রাজা আরবার॥
চলিছে রাজার সেনা আনন্দিত হৈয়া।
গুহক চণ্ডাল আছে পথ আগুলিয়া॥
তিন কোটি চণ্ডালেতে গুহক বেষ্টিত।
হুড়াহুড়ি করে দশরথের সহিত॥
গুহক চণ্ডাল বলে শুন দশরথ।
ভাঙ্গিয়া আমার দেশ করিলা কি পথ॥
বারে বারে যাহ তুমি এই পথ দিয়া।
সৈন্যেতে আমার রাজ্য ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
গঙ্গাস্নান করিতে তোমার থাকে মন।
আর পথ দিয়া রাজা করহ গমন॥

যদি ইচ্ছা থাকে হে যাইবে এই পথে।
দেখাও আমায় অগ্রে তব রঘুনাথে ॥
রাম রাম বলিয়া যে গুহক ডাকিল।
রথমধ্যে রামেরে ভূপতি লুকাইল ॥
লৈয়া দশরথ রাজা ধনুর্ব্বাণ হাতে।
রথের দ্বারেতে রাজা লাগিল ভাবিতে
চণ্ডালেরে মারিয়া যদ্যপি পাই যশ।
নীচজনে জিনিলে কি হইবে পৌরুষ ॥
যদি পরাজয় হয় চণ্ডালের রণে।
অপযশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে ॥
আমি যদি ছাড়ি নাহি ছাড়িবে চণ্ডাল।
কি করিব পথে এক বাধিল জঞ্জাল ॥
দুইজনে বাণবৃষ্টি করে মহাকোপে।
দোঁহাকার বাণেতে দোঁহার তনু কাঁপে।
এই মত বাণবৃষ্টি হইল বিস্তর।
উভয়ের সংগ্রাম হইল বহুতর ॥
দশরথ রাজা এড়ে পশুপতি-শর।
হস্তে গলে বন্ধন গুহককলেবর ॥
গুহেরে বান্ধিয়া রাজা তুলিলেন রথে।
বন্ধনে পড়িয়া গুহ লাগিল ভাবিতে ॥
যাহার লাগিয়া আসি আগুলিনু পথ।
দেখিতে না পাইলাম সে রাম কেমত ॥
এতেক ভাবিয়া গুহ করে অনুমান।
পায়েতে ধনুক টানে পায়ে এড়ে বাণ ॥
ভরত কহিল গিয়া রামের গোচরে।
এমত অপূর্ব্ব শিক্ষা নাহি চরাচরে ॥
পায়েতে ধনুক টানে পায়ে এড়ে বাণ।
দেখিতে কৌতুক রাম গেলেন সে স্থান ॥
যেই মাত্র গুহক দেখিল রঘুনাথে।
দণ্ডবৎ হইয়া রহিল যোড়হাতে ॥
শ্রীরাম বলেন ধনু টানহ কেমন।
গুহ বলে তোমাকে কহিব যে কারণ ॥
প্রাক্তন জন্মের কথা শুন নারায়ণ।
যে পাপে হইল মম চণ্ডালজনম ॥
অযোধ্যাক ছিলেন যখন দশরথ।
অন্ধক মুনির পুত্রে করিলেন হত ॥
মুনিহত্যা করিয়া আসিয়া তপোবনে।
লোটাইয়া পড়িলেন আমার চরণে ॥
বশিষ্ঠের পুত্র আমি বামদেব নাম।
তিনবার রাজারে বলানু রামনাম ॥
শুনিয়া বশিষ্ঠ শাপ দিলেন বিশাল।
যাহ বামদেব পুত্র হওগে চণ্ডাল ॥
এক রাম নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে ॥
লোটাইয়া পড়িলাম পিতার চরণে।
চণ্ডাল হইলে মুক্ত কাহার দর্শনে ॥
পিতা বলিলেন হবে শ্রীরামদর্শন।
তবে ত হইবে মুক্ত চণ্ডালজনম ॥
সেই হেতু জন্মিয়াছ দশরথঘরে।
চরণ পরশ দিয়া মুক্ত কর মোরে ॥
অনাথের নাথ তুমি ভকতবৎসল।
করুণাসাগর হরি তুমি সে কেবল ॥
চণ্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মন।
তবে কেন ধর নাম পতিতপাবন ॥
এতেক বলিয়া গুহ লাগিল কান্দিতে।
গুহের ক্রন্দনেতে কান্দেন রাম রথে ॥

করপুটে দাঁড়াইল পিতার সাক্ষাত। দেখিয়া রামেরে ভাবে ভরদ্বাজ মুনি।
ভিক্ষা দেহ গুহেরে বলেন রঘুনাথ॥ বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণু আইলা আপনি॥
রাজা বলে প্রাণ চাহ তাহা পারি দিতে মুনি বলে রাজা তব সকল জীবিতা।
চণ্ডালে তোমাকে দিমু বাধা নাহি ইথে॥ রাম তব পুত্র বটে জগতের পিতা॥
পাইয়া বাপের আজ্ঞা কৌশল্যানন্দন। ভরদ্বাজ একালে দেখেন চমৎকার।
খসাইলেন আপনি সে গুহের বন্ধন॥ দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু পরম আকার॥
শ্রীরাম বলেন অগ্নি জ্বালহ লক্ষ্মণ। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশেতে শোভিত পদাম্বুজ।
গুহকের সঙ্গে করি মিত্রতা এখন॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ॥
লক্ষ্মণ জ্বালেন অগ্নি, অগ্নি যে সাক্ষাত। শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি যত দেবগণ।
গুহ সঙ্গে মিত্রতা করেন রঘুনাথ॥ রামের শরীরে আরো দেখেন ভুবন॥
যেই তুমি সেই আমি বলেন শ্রীরাম। সমুচিত আতিথ্য করেন ভরদ্বাজ।
গুহ বলে ঘুচাইতে নারি নিজ নাম॥ সুখে রহিলেন সৈন্য সহ মহারাজ॥
শ্রীরামের জগতে হইল ঠাকুরালি। রামেরে লইয়া মুনি অন্তঃপুরে গিয়া।
প্রথমে করেন রাম চণ্ডালে মিতালি॥ শয়ন করেন দোঁহে একত্র হইয়া॥
বিদায় করিয়া রামে গুহ গেল ঘরে। যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
পুত্র লয়ে দশরথ গেল গঙ্গাতীরে॥ শিয়রে রাখিলেন দেবরাজ ধনুঃশর॥
অপূর্ব্ব অনন্ত ফল ভাস্করগ্রহণ। স্বপ্নে উপদেশ এই কহেন মুনিরে।
স্নান করি রাজা দান করিল কাঞ্চন॥ অক্ষয় ধনুক তূণ দেহ শ্রীরামেরে॥
ধেনুদান শিলাদান করে শত শত। এত বলি করিলেন বাসব প্রয়াণ।
রজত, কাঞ্চন তার নাম লব কত॥ প্রাতে রাম শিয়রে দেখেন গাণ্ডি বাণ॥
দান কর্ম্ম করিতে হইল বেলাক্ষয়। কহিলেন শ্রীরামেরে মুনি ভরদ্বাজ।
প্রদোষে গেলেন ভরদ্বাজের আলয়॥ তোমারে দিলেন ধনুর্ব্বাণ দেবরাজ॥
বসিয়া আছেন মুনি আপনার ঘরে। মুনির চরণে রাম করি প্রণিপাত।
চারি পুত্র সহ রাজা নমস্কার করে॥ আনিলেন সে ধনুক পিতার সাক্ষাৎ॥
যোড়হস্তে বলে রাজা মুনির গোচর। শুনি রাজা দশরথ সানন্দ হইয়া।
আসিয়াছে চারি পুত্র দেখ মুনিবর॥ আইলেন দেশে চারি কুমার লইয়া॥
আশীর্ব্বাদ কর চারি পুত্রে তপোধন। কৃত্তিবাস করে আশ পাই পরিত্রাণ।
বড়ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ॥ আদিকাণ্ডে গাইল রামের গঙ্গাস্নান॥

রাক্ষসের দৌরাত্ম্যে মুনিগণের যজ্ঞ হানি ও রাক্ষসদমনে চেষ্টা।

এইরূপে দশরথ চারি পুত্র লৈয়া।
সাম্রাজ্য করেন অতি সাবধান হৈয়া॥
হেথা মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ।
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয় রাক্ষস কারণ॥
যজ্ঞ আরম্ভন যেই করে মুনিবর।
করে রক্ত বর্ষণ মারীচ নিশাচর॥
যজ্ঞহীন হইলেক মিথিলাভুবন।
করেন জনক যুক্তি লয়ে মুনিগণ॥
তার মধ্যে বলিলেন বিশ্বামিত্র মুনি।
অযোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্রে আমি আনি॥
রাক্ষসবধের হেতু ধরি রামবেশ।
দশরথগৃহে অবতীর্ণ হৃষীকেশ॥
বলিলেন জনক শুনহ মহাশয়।
তুমি রক্ষা করিলে এ যজ্ঞ রক্ষা হয়॥
বিশ্বামিত্র সকলেরে করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন যথা রাম অযোধ্যা নিবাস॥
উপস্থিত হইলেন অযোধ্যার দ্বারে।
দ্বারী গিয়া জানাইল তখনি রাজারে॥
ভূপতি শুনিবামাত্র বিশ্বামিত্রনাম।
চিন্তিয়া কহেন বুঝি বিধি আজি বাম॥
বিশ্বামিত্র মুনি সেই বড়ই বিষম।
প্রমাদ ঘটায় কিম্বা কবে কোন ক্রম॥
সূর্য্যবংশে ছিল হরিশ্চন্দ্র মহারাজ।
ভার্য্যা পুত্র বেচাইয়া দিল তারে লাজ॥
আসি বন্দিলেন রাজা মুনির চরণ।
শিষ্টাচারপূর্ব্বক করেন নিবেদন॥
তব আগমনে মম পবিত্র আলয়।
আজ্ঞা কর কোন কার্য্য করি মহাশয়॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ দশরথ।
শ্রীরামেরে দেহ যদি হয় অভিমত॥
মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়া প্রয়াস।
রাক্ষস আসিয়া সদা করে যজ্ঞনাশ॥
এই ভার মহারাজ দিলাম তোমারে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেহ যজ্ঞ রাখিবারে॥
যেইমাত্র বিশ্বামিত্র কহেন এ কথা।
ভূপতি ভাবেন মনে হেট করি মাথা॥
পুত্রশোকে মৃত্যু মম লিখন কপালে।
না জানি হইবে মম মৃত্যু কোন কালে॥
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক ধুক।
কখন মরিব আমি না দেখে চন্দ্রমুখ॥
প্রাণ চাহ যদি মুনি প্রাণ দিতে পারি।
একদণ্ড রামচন্দ্রে না দেখিলে মরি॥
অতএব রামচন্দ্র না দিব তোমারে।
একদণ্ড না দেখিলে হৃদয় বিদরে॥
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন।
আদিকাণ্ড গায় কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥

শ্রীরামকে রাক্ষসযুদ্ধে প্রেরণ করিতে দশরথের অনিচ্ছা।

যদ্যপি শয়নে থাকি, রামকে হৃদয়ে রাখি,
ভূমে রাখি নাহিক প্রতীত।
স্বপনে না দেখি তায়, প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়,
চমকিয়া চাহি চারিভিত॥
যেমন পেয়েছি রামে, কহি সে সকল ক্রমে,
মৃগয়া করিতে গিয়া বনে।
সিন্ধুনামে মুনিবরে, সরোবরে জল ভরে,
তারে মারি শব্দভেদী বাণে॥
মৃতমুনি কোলে করি, গেলাম অন্ধকপুরী,
দেখি মুনি অগ্নির সমান।
পুত্র পুত্র বলি ডাকে, মৃতপুত্র দিনু তাকে,
পুত্রশোকে সে ছাড়িল প্রাণ॥
ছিলাম সন্তানহীন, মনোদুঃখে রাত্রিদিন,
বধিলাম সিন্ধুর জীবন।
কাঁদিয়া সিন্ধুর বাপ, দিল মোরে অভিশাপ,
তেঁই পাইলাম এই ধন॥
রাজা বলে মুনিরাজ, মম পুরে কিবা কাজ,
বল প্রভু আইলা কি কারণ।
যত ঋষি যজ্ঞ করে, রাক্ষসে রাখিতে নারে,
লৈয়া যাবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
রাজার বচন শুনি, কুপিলেন মহামুনি,
ত্বরা দেহ তোমার কুমার।
আপন মঙ্গল চাহ, শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ,
কৃত্তিবাস কহে যুক্তি সার॥

দশরথের বঞ্চনা, বিশ্বামিত্রের কোপ ও প্রতিগমন, রাক্ষসবধার্থ শ্রীরামের যাত্রা।

রাজা বলিলেন মুনি শুন নিবেদন।
ধনুর্ব্বাণ নাহি জানে কি করিবে রণ॥
অত্যল্প বয়স মম পুত্র চারি গুটি।
শিরে চুল নাহি ঘুচে আছে পঞ্চ ঝুটি॥
অন্য সৈন্য যত চাহ লহ তপোধন।
তাহারা করিবে নিশাচরে নিবারণ॥
শুনিয়া কহেন বিশ্বামিত্র তপোধন।
কটকে খাইবে কত কোথা পাব ধন॥
একা রাম গেলে হয় কার্য্যের সাধন।
সহস্র কটকে মম নাহি প্রয়োজন॥
তব বংশে ছিলেন যে হরিশ্চন্দ্র রাজা
পৃথিবী আমারে দিয়া করিলেন পূজা
তথাপি না পাইলেন মনের সান্ত্বনা।
ভার্য্যা পুত্র বেচিয়া সে দিলেন দক্ষিণা॥
একা রামে দিতে তুমি কর উপহাস।
সূর্য্যবংশ বুঝি আজি হইল বিনাশ॥
চিন্তিত হইয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
ডাকিলেন ভরত শত্রুঘ্ন দুইজনে॥
দোঁহে ডাকিলেন সেই মুনির সাক্ষাতে
রাজা বলিলেন যাহ মুনির সঙ্গেতে॥
ভূপতির বঞ্চনায় ভ্রান্ত তপোধন।
মনে ভাবিলেন এই শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
অগ্রে অগ্রে মুনি যান পাছে দুইজন।
সরযূ নদীর তীরে দিল দরশন॥
মুনি বলিলেন শুন ভূপতিকুমার।
হেথা আগমনের পথ আছে দ্বিপ্রকার॥
এই পথে গেলে তিন দিনে যাই ঘর।
এই পথে গেলে লাগে তৃতীয় প্রহর॥
তৃতীয় প্রহর পথে কিন্তু আছে ভয়।
সেই পথে রাক্ষসী তাড়কা নামে রয়॥
তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত মুনিগণ।
কোনপথে যাইতে তোমার লাগে মন॥
বলিলেন ভরত শুনহ তপোধন।
দুষ্ট ঘাঁটাইয়া পথে কোন প্রয়োজন॥
একথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ইনি কি হবেন যোগ্য রাক্ষসবারণে॥
শুনি এক রাক্ষসের নামে এত ডর।
মারিবেন কিসে তিন কোটি নিশাচর॥
রাজার শঠতা মুনি ভাবেন অন্তরে।
শ্রীরামে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে॥
আমার সহিত আজি করে উপহাস।
অযোধ্যা সহিত আজি করিব বিনাশ॥
ক্রোধে ফিরিলেন পুনঃ বিশ্বামিত্র ঋষি।
নির্গত হইল তাঁর নেত্রে অগ্নিরাশি॥
সেই অগ্নি লাগিয়া অযোধ্যানগরে।
প্রজার সকল ঘর দ্বার ভস্ম করে॥
কান্দিয়া চলিল প্রজা রামের গোচরে।
বিশ্বামিত্র মুনি আসি সর্ব্বনাশ করে॥

তোমারে না দিলেন দিলেন ভরতেরে।
তেকারণে এ আপদ অযোধ্যানগরে॥
প্রজার করুণা শুনি রামের তরাস।
ধাইয়া গেলেন রাম বিশ্বামিত্র পাশ॥
মুনির চরণ ধরি বলে রঘুমণি।
প্রজালোকে রক্ষা তুমি করহ আপনি॥
অপরাধ যেই করে দণ্ড কর তার।
নিরপরাধীর দণ্ড করা অবিচার॥
যেজন হইয়া মুনি রাগে দেন মন।
পূর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট তাঁর হয় সেইক্ষণ॥
পূর্ব্বে পাঠাইতে পিতা হলেন কাতর।
যজ্ঞ রক্ষা করি গিয়া মিথিলানগর॥
হাসিলেন মুনিরাজ রামের বচনে।
অযোধ্যার পানে চান অমৃতনয়নে॥
সকল করিতে পারে তপের কারণ।
যেমন অযোধ্যাপুরী হইল তেমন॥
মুনির চরিত্র দেখি রামের তরাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।

মিথিলার যজ্ঞ রাখিতে শ্রীরাম লক্ষ্মণের গমন ও মন্ত্রদীক্ষা।

শিরে পঞ্চঝুটি রাম বিষ্ণু-অবতার।
মুগ্ধ হইলেন মুনি রূপেতে তাঁহার॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদিত আকাশে।
মুনি বলে রামচন্দ্র চল মম দেশে॥
জানিলেন মহারাজ রামের গমন।
লক্ষ্মণ সহিত রামে করেন অর্পণ॥
বলিলেন বিশ্বামিত্র রাজার গোচর।
রাম লাগি চিন্তা না করিহ নরেশ্বর॥
তুমি নাহি জানহ রামের গুণলেশ।
রাক্ষস বধিতে অবতীর্ণ হৃষীকেশ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে লয়ে আমি দেশে যাই
স্থির হও মহারাজ কোন চিন্তা নাই॥
রাজারে কহিয়া এই প্রবোধবচন।
মুনি বলিলেন চল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম বলেন মুনি যদি বল তুমি।
মাতৃস্থানে বিদায় লইয়া আসি আমি॥
মাকে না কহিয়া যাব মিথিলা নগর।
কান্দিবেন অন্নজল ছাড়ি নিরন্তর॥
গেলেন শ্রীরামচন্দ্র মায়ের মন্দিরে।
প্রণাম করিয়া পরে বলেন মায়েরে॥
আইলেন বিশ্বামিত্র লইতে আমারে।
মিথিলায় যাই আমি যজ্ঞ রাখিবারে॥
সুভাবেতে আমায় করহ আশীর্ব্বাদ।
যুদ্ধে জয় করি যদি তোমার প্রসাদ॥
প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিতেছি আমি।
আমার লাগিয়া শোক না করিহ তুমি॥
কৌশল্যা শুনিয়া তাহা করেন রোদন।
ভিজিল নয়ননীরে গাত্রের বসন॥

কাতরে কৌশল্যা কোলে করিয়া রামেরে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন কর দিয়া শিরে॥
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ-বচন।
নেত্রনীর নেত্রেতে হইল নিবারণ॥
মাতৃপদধূলি রাম বন্দিলেন মাথে।
শুভযাত্রা করিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ লৈয়া যায় বিশ্বামিত্র।
রাজার নেত্রের নীরে ভাসিলেক গাত্র॥
কতদূর গিয়া রাম হন অদর্শন।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন রোদন॥
রাজাকে প্রবোধ করে যত পাত্রগণ।
কে করে অন্যথা যাহা বিধির লিখন॥
রামে দেখি মুনিবর আনন্দিতমন:
রামের বিবাহ হবে দেবের ঘটন॥
অগ্রে মুনিবর যান পাছে দুইজন।
ব্রহ্মার পশ্চাতে যেন অশ্বিনীনন্দন॥
কান্দিতে কান্দিতে সবে গেল নিজ বাসে।
রামে লৈয়া বিশ্বামিত্র বনেতে প্রবেশে॥
অগ্রে মুনি যান পাছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আতপে হইল ম্লান দোঁহার বদন॥
তাহা দেখি বিশ্বামিত্র অন্তরে চিন্তিত।
এতদিনে শ্রীরামের দুঃখ উপস্থিত॥
রবির আতপেতে হইল মুখে ঘাম।
বহুকাল কিরূপে ভ্রমিবে বনে রাম॥
বিশ্বামিত্র এইমত ভাবিলা অন্তরে।
করাইল মন্ত্রদীক্ষা তথা শ্রীরামেরে॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবীর।
স্নান কর এই জলে সরযূনদীর॥
যত রাজা পূর্ব্বে সূর্য্যবংশে হয়েছিল।
এই স্থানে প্রাণ ছাড়ি স্বর্গবাসে গেল॥
এই পুণ্যতীর্থে রাম স্নান কর তুমি।
তোমাকে সুমন্ত্র দীক্ষা করাইব আমি॥
শোক দুঃখ কখন না হইবে অন্তরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা না হইবে সহস্র বৎসরে॥
করিলেন রামচন্দ্র সে মন্ত্র গ্রহণ।
রামেরে কহিতে তাহা শিখিল লক্ষ্মণ॥
দৃঢ় করি শিখিলেন ভাই দুই জন।
আনন্দিত হইলেন দেখি দেবগণ॥
বহুকাল অনাহারে থাকিবে লক্ষ্মণ।
তাহাতে হইবে ইন্দ্রজিতের মরণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্বের শিক্ষা।
আদিকাণ্ডে গাইল রামের মন্ত্রদীক্ষা॥

শ্রীরামহস্তে তাড়কা রাক্ষসীর বধ ও তাঁহার চরণস্পর্শে অহল্যার উদ্ধার।

গুরুর চরণে রাম করিলেন নতি।
রামে লৈয়া বিশ্বামিত্র করিলেন গতি॥
তাড়কার বনে আসি দিল দরশন।
মুনি বলিলেন শুন ভাই দুইজন॥
এই পথে পাই ঘর তৃতীয় প্রহরে।
তিন দিনে এই পথে যাই মম ঘরে॥
তিন প্রহরের পথে কিন্তু ভয় করি।
রাক্ষসী তাড়কা নামে আছে ভয়ঙ্করী॥
তাড়কা ধরিয়া খায় যত জীবগণ।
কোন পথে যাই বল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
করিলেন রাম গুরুবাক্যের উত্তর।
তিন দিন ফেরে কেন যাব মুনিবর॥
যদি সে রাক্ষসী পথে আইসে খাইতে।
বিচারে নাহিক দোষ তাহারে মারিতে॥
রামেরে কহেন বিশ্বামিত্র মুনিবর।
ও পথের নামে মম গায়ে আসে জ্বর॥
তোমার বাসনা রাম না পারি বুঝিতে।
আমা লৈয়া যাহ বুঝি রাক্ষসেরে দিতে॥
যখন রাক্ষসী মোরে আসিবে তাড়িয়া।
আমারে এড়িয়া দোঁহে যাবে পলাইয়া॥
গুরুর বচনে হাসিলেন প্রভু রাম।
বিফল ধনুক ধরি ব্যর্থ রামনাম॥
এক বাণ বিনা কি দ্বিতীয় বাণ ধরি।
তোমার দোহাই যদি তিন বাণ মারি॥

এইমত রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করিতে।
চলিলেন মুনি সে তাড়কা দেখাইতে॥
উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর।
দূর হৈতে দেখাইলেন তাড়কার ঘর॥
কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইল।
অতি ত্রাসে মুনিরাজ ভয়ে পলাইল॥
শ্রীরাম বলেন ভাই মুনির সহিত।
শীঘ্র যাহ গুরু একা যান অনুচিত॥
লক্ষ্মণ বলেন রামে যোড় করি হাত।
থাকুক সেবক সঙ্গে রাম রঘুনাথ॥
শুনি যা সে সব কথা বড়ই বিষম।
একেলা কেমনে রাম করিবে বিক্রম॥
শ্রীরাম বলেন ভাই ভয় নাহি মনে।
কি করিতে পারে ভাই রাক্ষসীর গণে॥
সকল রাক্ষসী যদি হয় এক মেলি।
লঙ্ঘিতে না পারে মম কনিষ্ঠ অঙ্গুলি॥
গেলেন মুনির সঙ্গে লক্ষ্মণ তখন।
তাড়কার প্রতি রাম করেন গমন॥
বাম হাঁটু দিয়া রাম ধনু মধ্যখানে।
দক্ষিণ হস্তেতে গুণ দিলেন সে স্থানে॥
আঁটিয়া সে পীতবস্ত্র বান্ধিলেন রাম।
বামহস্তে ধনু ধরি দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
প্রথমতঃ দিলেন সে ধনুকে টঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে লাগিল চমৎকার॥

শুয়েছিল রাক্ষসী সে সুবর্ণের খাটে।
ধনুকটঙ্কার শুনি চমকিয়া উঠে॥
বসিয়া রাক্ষসী সেই একদৃষ্টে চায়।
দুর্ব্বাদলশ্যাম রূপ হেরিল তথায়॥
উঠিয়া চলিল সেই রাম বিদ্যমান।
ডাকিয়া বলিল তোর লব আমি প্রাণ॥
ব্রাহ্মণের চর্ম্ম তার গায়ের কাপড়।
চলিতে তাহার বস্ত্র করে মড় মড়॥
ব্রাহ্মণের মুণ্ড তার কর্ণের কুণ্ডল।
মনুষ্যের মুণ্ডমালা গলে ঝলমল॥
বসিতে আসন নাহি ভাবে মনে মন।
ইহার চর্ম্মেতে হবে বসিতে আসন॥
রক্ত মাংস মুনির শরীরে নাহি পাই।
অস্থি চর্ম্ম সার মাত্র শুধু হাড় খাই॥
অপূর্ব্ব ইহার মাংস দিলেন বিধাতা।
কহিলেন রাম শুনি তাড়কার কথা॥
তাম্রবর্ণ দেখি তোর গায়ে লোমাবলি।
দন্ত গোটা দেখি যেন লোহার শিকলি॥
বদনব্যাদান করি আইলি খাইতে।
পাঠাইব তোরে আজি যমের ঘরেতে॥
মনুষ্য খাইয়া চেড়ি দেশ কৈলি বন।
তোর ডরে পথে নাহি চলে সাধুজন॥
শুনিয়া রামের বাক্য কুপিয়া অন্তরে।
নিকটে আসিয়া সে বিকট মূর্ত্তি ধরে॥
রামকে খাইতে চায় ডরে নাহি পারে।
শালগাছ উপাড়িল ঘোর হুহুঙ্কারে॥
শালগাছ উপাড়িয়া আনে ঘন পাকে।
দূর দূর করিয়া গভীর স্বরে ডাকে॥
তাহা দেখি রঘুনাথ এড়িলেন বাণ।
বাণাঘাতে করিলেন গাছ খান খান॥
গাছ কাটা দেখিয়া কাঁপিয়া গেল মনে।
শিংশপার গাছ ধরি ঘন ঘন টানে॥
শিংশপার গাছ তোলে রামেমারিবারে।
তার মুখ ভেদিলেন রাম এক শরে॥
তথাপি তাড়কা যায় রামে গিলিবারে।
মহাবীর তবু ভয় না করেন তারে॥
বাণের উপরে বাণ শব্দ ঠনঠনি।
বর্ষাকালে বিদ্যুতের যেন ঝনঝনি॥
শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলিল দেবগণ।
বজ্রবাণে তাড়কার বধহ জীবন॥
বজ্রবাণ এড়েন রাম বজ্রের হুড়ুকে।
নির্ঘাত বাজিল বাণ তাড়কার বুকে॥
বুকে বাণ বাজিয়া সে অচেতন হৈল।
পঞ্চাশ যোজন গিয়া তাড়কা পড়িল॥
বিপরীত ডাক ছাড়ি ছাড়িলেক প্রাণ।
বিশ্বামিত্র মুনি হইলেন হতজ্ঞান॥
পাঠাইয়া তাড়কারে যমের সদন।
করিলেন রাম মুনির চরণবন্দন॥
চেতন পাইয়া বলে গাধির নন্দন।
তাড়কা মারিলা বাছা কৌশল্যানন্দন॥
শ্রীরাম বলেন গুরু কি শক্তি আমার।
তাড়কারে বধিলাম প্রসাদে তোমার॥
মুনি বলিলেন শুন কৌশল্যানন্দন।
তাড়কারে দেখি গিয়া তাড়কা কেমন॥
তাড়কা দেখিতে মুনি করেন প্রস্থান।
মরেছে তাড়কা তবু মুনি কম্পবান॥
তাড়কারে দেখিয়া ভাবেন মুনি মনে।
এমন বিকট মূর্ত্তি না দেখি নয়নে॥
তাড়কা মারিয়া রাম রাজীবলোচন।
পবনের জন্মভূমে করেন গমন॥
বিশ্বামিত্র কহিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এ স্থানে হইল ঊনপঞ্চাশ পবন॥

কৃত্তিবাস।

কবি-কঙ্কণ চণ্ডী।

গঙ্গার উৎপত্তিকথন।

অবধানে কর্ণধার, শুন পুরাণের সার,
কহিব গঙ্গার উপদেশ।
হরিপদে উৎপত্তি, ব্রহ্মকমণ্ডলে স্থিতি,
হরশিরে করিল প্রবেশ॥
এক কালে পশুপতি, পঞ্চমুখে করি স্তুতি,
গান গীত হরিসন্নিধানে।
গীতে সমর্পিত মন, দ্রব হৈল নারায়ণ,
বিধি রাখে করঙ্গআধানে॥
ব্রহ্ম কমণ্ডলে বাস, আছিল ব্রহ্মার পাশ,
পবিত্র করিয়া ব্রহ্মলোক।
ইন্দ্রের সাধিতে মান, কৃপাসিন্ধু ভগবান,
কশ্যপ মুনির হৈল তোক॥
হইয়া বামন বটু, বেদ-অংশে হয় পটু,
ধরি দণ্ড মেখলা অজিনে।
যুক্তি করি তার সনে, আইলা রাজার স্থানে,
অশ্বমেধ-অবসান দিনে॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলি, জিজ্ঞাসেন কৃতাঞ্জলি,
কহ দ্বিজ নিজ অভিলাষ।
কহিলেন ভগবান, ত্রিপদ ধরণী দান,
আশে আইলাম তব পাশ॥
দান দিতে চাহে রায়, দ্বিজ নাহি দেয় সায়,
দিল দান তিন পদ ক্ষিতি।
ক্ষিতি যুড়ি পদ একে, আর এক ঊর্দ্ধলোকে,
তৃতীয় বলির মাথে স্থিতি॥

বলি চতুর্দ্দিকে চাই, কোথায় নাহিক ঠাঁই,
শিরে রাখে বিষ্ণুর চরণ।
সংসার জানি বিফল, শেষে গেল রসাতল,
অষ্টাদশে করিল লিখন॥
ভূভার তারণ ভার, চতুর্দ্দশ অবতার,
হিরণ্যকশিপু দৈত্যরাজা।
ভায়ের বিনাশ দেখি, চিত্তে রাজা হৈয়া দুখী,
সহস্র বৎসর কৈল পূজা॥
ইক্ষুর নন্দন দুই, ব্রহ্মা আইলা তার ঠাঁই,
কমণ্ডলুজল তথি দিল।
পেয়ে কমণ্ডলুজল, দাণ্ডাইল দৈত্যবল,
সত্য করিয়া বর নিল॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর, জিনিলেক পুরন্দর,
দৈত্যসুতে আহ্লাদ জন্মিল।
হরি নাম নিরন্তর, হিংসা কৈল দৈত্যেশ্বর,
নরসিংহরূপে বিদারিল॥
হরিপদ নিজ ধামে, দেখি ব্রহ্মা সসম্ভ্রমে,
পাদ্য দিল কমণ্ডলু ঢালি।
কলুষনাশিনী ক্রমে, আইলা গঙ্গা ধ্রুবধামে,
সুমেরু করিয়া পুণ্যশালী॥
আসিয়া গগনতলে, ভ্রমে ইন্দুর মণ্ডলে,
উরিলা কণকগিরিশিরে।
সকল কলুষহরা, হইলা গঙ্গা চারিধারা,
পূর্ব্ব যাম্য পশ্চিম উত্তরে॥
সীতা নামে পূর্ব্বধারা, আসি কৈলা দ্রুততরা,
ভদ্রা সে পাবনী সুরধুনী।
ধৌতহরিপদদ্বন্দ্বা, দক্ষিণে অলকনন্দা,
জম্বুদ্বীপনিস্তারকারিণী॥

পশ্চিমে ধবল ধারা, বঙ্ক নামে পুণ্যধারা,
পবিত্র করিয়া কেতুমাল।
উত্তরে মঙ্গলতারা, ভদ্র নামে শেষ ধারা,
স্নানে যার পুণ্য সুবিশাল ॥
পুরাণ অবধি করি, চারি হস্ত ধরি হরি,
ভাগ্যবান বৈসে এই স্থলে।
ইথে জন্ম করে জপ, কেবল অক্ষয় তপ,
মুক্তি হয় যদি মরে জলে ॥
শুনি গঙ্গা-অবতার, সুখী হৈল কর্ণধার,
স্নান কৈল তথি জনে জনে।
আচ্ছাদিয়া ধৌত পটে, লইল নূতন ঘটে,
শ্রীকাবকঙ্কণ রস ভণে ॥

শ্রীমন্তকে ভগবতীর মগরায় ছলনা।

ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর। উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর ॥
নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল। চারি মেঘে বরিষে মূষল ধারে জল ॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা। জলে মহী একাকার পথ হৈল হারা ॥
দিবানিশি সমান যে মেঘের গর্জ্জন। কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥
পরিচ্ছন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী। স্মরয়ে সকল লোক জৈমিনি জৈমিনি ॥
পূর্ব্ব হৈতে আইল বন্যা দেখিতে ধবল। সাত তাল হৈয়া গেল মগরার জল ॥
ঝঞ্ঝনা চিকুর পড়ে কামান কৃপাণ। ভাঙ্গিয়া নৌকার ঘর করে খান খান ॥
বাপের উদ্দেশে ছিরা চলিল সিংহল। খুল্লনা জননী তার কান্দিয়া বিকল ॥
মগরাতে ঝড় বৃষ্টি করিব বিদিত। দৃঢ় ভক্তি হয় নয় জানিব চরিত ॥
বিপদ দেখিয়া ছিরা করে কি স্মরণ। সঙ্কটে রাখিব আজি দাসীর নন্দন ॥
নদ নদীগণ তবে করিল প্রয়াণ। অম্বিকামঙ্গল কবি-কঙ্কণে গান ॥

কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল।

অরি হৈল দেবরাজ, বেঙ্গতরকা পড়ে বাজ,
বরিষে মুষলধারে জল ॥
শিল বাজে যেন গুলি, ভাঙ্গিল মাথার খুলি,
বেগে যেন জল বাজে কাঁড়।
বিষম জলের রয়, ভয়ে প্রাণ স্থির নয়,
দাঁড়ীরা ধরিতে নারে দাঁড় ॥

দুঃসহ বিষম ঝড়ে, উপাড়িয়া গাছ পড়ে,
দুকূল বহিয়া পথে খানা।
কহ কর্ণধার ভাই, কেমনে নিস্তার পাই,
রাশি রাশি কত ধায় ফেণা॥
ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে, বৃষ্টি জলে ডিঙ্গা বুড়ে,
নেয়ে পাইক জড় হৈল শীতে।
শুন ভাই কর্ণধার, নাহি দেখি প্রতিকার,
জলে অহি ভাসে শতে শতে॥
দেখি রে নায়ের পাশে, মকর কুম্ভীর ভাসে,
গিরিগুহা বিকট দশন।
কাণ্ডার উপায় বল, দেখিয়া প্রলয় জল,
আজি দেখি সঙ্কটে জীবন॥
ডুবুডুবু করে ডিঙ্গা, স্মরণ করহ গঙ্গা,
অন্তকালে ভজ ভগবতী।
পড়িয়া বিষম ফাঁদে, ভবানী বলিয়া কাঁদে,
হৃদয়ে ভাবিয়া শ্রীপতি॥

রক্ষ মা ভবানি মোরে কি বলিব সার। তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর॥
তোমা আরাধিয়া যাত্রা করিনু আসিতে। সমর্পিয়া দিলা মাতা তব হাতে হাতে॥
তবে কেন বল করে মগরার জল। নিশ্চয় জানিনু মোর জনম বিফল॥
ভগবতী বলে সাধু ঝাঁপ দিল জলে। রথভরে অভয়া শ্রীমন্তে কৈল কোলে॥
সদয় হইল মাতা সেবকবৎসল। চণ্ডীর কৃপায় হৈল এক হাঁটু জল॥
দুর্গা দুর্গহরা তুমি দুর্গতিনাশিনী। দুর্জ্জয়া দক্ষিণা কালী নগেন্দ্রনন্দিনী॥
নিদ্রারূপা হৈয়া তুমি ভাঁড়ালে প্রহরী। যখন দৈবকী হৈতে জন্মিল শ্রীহরি॥
নানা অবতারে তুমি বিষ্ণুসহায়িনী। দুর্গতিনাশিনী জয়া দুর্গতিহারিণী॥
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালী। পুরোত্তরা হৈয়া তুমি হইলে শৃগালী॥
ভূভার খণ্ডন কৈলে আপনি প্রকার। কংসভয়ে কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার॥
ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চণ্ডীর কৃপায়। ডিঙ্গা লৈয়া সদাগর দ্রুতগতি যায়॥
ডানি বামে ছেড়ে যায় কত শত দেশ। সঙ্কেতমাধবে দেখে সোণার মহেশ॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

অন্নদা-মঙ্গল।

শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা।

পুণ্যভূমি বারাণসী, বেষ্টিত বরুণ অসি,
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত।
আনন্দকানন নাম, কেবল কৈলাস ধাম,
শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত॥
বাপী যাহে জ্ঞানবাপী, নামে মোক্ষ পায় পাপী,
মহিমা কহিতে কেবা পারে।
মণিকর্ণী পুষ্করিণী, মোক্ষপদবিধারিনী,
সার বস্তু অসার সংসারে॥
দশাশ্বমেধের ঘাট, চৌষট্টি যোগিনীপাট,
নানা স্থানে নানা মহাস্থান।
তীর্থ তিনকোটি সাড়ে, একক্ষণ নাহি ছাড়ে,
সকল দেবের অধিষ্ঠান॥
মহেশের রাজধানী, দুর্গা যাহে মহারাণী,
যাহে কালভৈরব প্রহরী।
শমনের অধিকার, না হয় স্মরণে যার,
ভবসিন্ধু তরিবায় তরী॥
যাহে জীব ত্যজি জীব, সেইক্ষণে হয় শিব,
পুনঃ নহে জঠরযাতনা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, দনুজ মনুজ রক্ষ,
সবে যার করয়ে মাননা॥
শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত, যাহে সদা অধিষ্ঠিত,
তাহাতে প্রধান বিশ্বেশ্বর।
যত যত যশোধাম, প্রকাশি আপন নাম,
শিবলিঙ্গ স্থাপিলা বিস্তর॥

দেবতা কিন্নর নর, সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর,
তপস্যা করয়ে মোক্ষ আশে।
দেখিয়া কাশীর শোভা, মহেশের মনোলোভা,
বিহরেন ছাড়িয়া কৈলাসে॥
সর্ব্ব সুখময় ঠাঁই, সবে মাত্র অন্ন নাই,
দেখিয়া ভাবেন সদাশিব।
অনেকের হৈল বাস, সকলের অন্ন আশ,
কি প্রকারে অন্ন যোগাইব॥
আপন আহার বিষ, ধ্যানে যায় অহর্নিশ,
অন্ন সনে নাহি দরশন।
এখানে বসিবে যারা, অন্নজীবী হবে তারা,
অন্ন বিনা না রবে জীবন॥
এত ভাবি ত্রিলোচন, সমাধিতে দিয়া মন,
বসিলেন চিন্তাযুক্ত হয়ে।
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠানে, অন্নে পূর্ণ কর স্থানে,
ভারত দিলেন যুক্তি কয়ে॥

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরীনির্ম্মাণের অনুমতি

ভব ভাবি চিতে, পুরী নির্ম্মাইতে,
বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান।
বিশ্বকর্ম্মা আসি, প্রবেশিলা কাশী,
যোড়হাতে সাবধান॥
বিশ্বকর্ম্মে হর, কহিলা বিস্তর,
শুনরে বাছা বিশাই।
অন্নপূর্ণা আসি, বসিবেন কাশী,
দেউল দেহ বানাই॥

বিশ্বকর্ম্মা শুনি, নিজ পুণ্য গণি,
দেউল কৈল নির্ম্মাণ।
অন্নদা-মূরতি, নিরুপম অতি,
নিরমায় সাবধান॥
রতন-দেউল, ভুবনে অতুল,
কোটি রবি পরকাশ।
বিবিধ বন্ধান, অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ,
দেখি সুখী কৃত্তিবাস॥
দেউল ভিতরে, মণিবেদী পরে,
চিন্তামণির প্রতিমা।
চতুর্ব্বর্গপ্রদা, গড়িল অন্নদা,
অনন্ত নামমহিমা॥
মণিময়চ্ছদ, গড়ে কোকনদ,
অরুণ-কিরণ-শোভা।
ভুবনমণ্ডল, করয়ে উজ্জ্বল,
মহেশের মনোলোভা॥
তাহার উপরি, পদ্মাসন করি,
অন্নদা মূরতি গড়ে।
পদতলে রঙ্গে, দেখি অষ্ট অঙ্গে,
অরুণ চরণে পড়ে॥
অতি নিরমল, চরণযুগল,
সুশোভিত নখ ছাঁদে।
দিনে দিনে ক্ষীণ, কলঙ্কে মলিন,
কত শোভা হবে চাঁদে॥
কারণ অমৃত, পলান্ন সম্বৃত,
পানপাত্র হাতা শোভে।
সম্মুখে শঙ্কর, নাচেন সুন্দর,
অন্ন খেয়ে অন্নলোভে॥

কোটি সুধাকর, বদন সুন্দর,
রতনমুকুট শিরে।
অর্দ্ধশশী ভালে, কেশ মল্লীমালে,
অলি মধুলোভে ফিরে॥
অন্নদা-মূরতি, দেখি পশুপতি,
বিশাইরে দিলা বর।
কৃষ্ণচন্দ্রমত, রচিলা ভারত,
কবি রায় গুণাকর॥

ব্যাসবর্ণন।

ব্যাস নারায়ণ-অংশ, ঋষিগণ-অবতংস,
যাহা হৈতে আঠার পুরাণ।
ভারত পঞ্চম বেদ, নানা মত পরিচ্ছেদ,
বেদভাগে বেদান্ত বাখান॥
সদা বেদপরায়ণ, প্রকাশিলা নারায়ণ,
শিষ্যগণ বৈষ্ণবসংহতি।
পিতা যাঁর পরাশর, শুকদেব বংশধর,
জননী যাঁহার সত্যবতী॥
দাঁড়াইলে জটাভার, চরণে লুটায় তাঁর,
কক্ষ লোমে আচ্ছাদয়ে আঁটু।
পাকা গোঁপ পাকা দাড়ি, পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি,
চলনে কতেক আঁটু বাঁটু॥
কপালে চড়ক-ফোঁটা, গলে উপবীত মোটা,
বাহুমূলে শঙ্খচক্র-রেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা, কলি, মৃগ, বাঘথাবা,
সারি সারি হরিনাম লেখা॥

তুলসীর কণ্ঠী গলে, লম্বিমালা করতলে,
হাতে কাণে থরে থরে মালা।
কোশাকুশী কুশাসন, কক্ষতলে সুশোভন,
তাহে কৃষ্ণসারমৃগছালা॥
কটিতটে ডোর ধরি, তাহাতে কৌপীন পরি,
বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু তুম্বীফল, করঙ্গ পিবারে জল,
হাতে আষা হিঙ্গুল বরণ॥
এই বেশে শিষ্যগণ, সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ,
পাঁজি পুথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম আগম মত, পুরাণ সংহিতা যত,
তর্কাতর্কি নানা মত কয়ে॥
কে কোথা কি করে দান, কে কোথা কি করে ধ্যান,
পূজা করে কেবা কিবা দিয়া।
কে কোথা কি মন্ত্র লয়, কোথা কোন যজ্ঞ হয়,
আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া॥
জগতের হিতে মন, ঊর্দ্ধবাহু হয়ে কন,
ধর্ম্মে মতি হউক সবার।
ধন নাহি স্থির রয়, সদা আপনার নয়,
সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার॥
এইরূপে শিষ্য সঙ্গে, সর্ব্বদা ফিরেন রঙ্গে,
চিরজীবী নরাকার লীলা।
এক দিন দৈববশে, শিষ্যসহ শাস্ত্ররসে,
নৈমিষ কাননে উত্তরিলা॥
শৌনকাদি ঋষিগণ, পূজা করে ত্রিলোচন,
গালবাদ্যে বিল্বপত্র দিয়া।
গলায় রুদ্রাক্ষমাল, অর্দ্ধচন্দ্রে শোভে ভাল,
কলেবরে বিভূতি মাখিয়া॥

শিব ভর্গ ত্রিলোচন, বৃষধ্বজ পঞ্চানন,
চন্দ্রচূড় গিরিশ শঙ্কর।
ভব সর্ব্ব ব্যোমকেশ, বিশ্বনাথ প্রমথেশ,
দেবদেব ভীম গঙ্গাধর॥
ঈশ্বর ঈশান ঈশ, কাশীশ্বর পার্ব্বতীশ,
মহাদেব উগ্র শূলধর।
বিরূপাক্ষ দিগম্বর, ত্র্যম্বক গিরিশ হর,
রুদ্র পুরহর স্মরহর॥
এইরূপে ঋষি যত, শিবের সেবায় রত,
দেখি ব্যাস নিষেধিয়া কন।
ভারত পুরাণে কয়, ব্যাসের কি ভ্রান্তি হয়,
বুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেমন॥

শিবপূজানিষেধ।

বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ।
কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন॥
সর্ব্বশাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই।
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই॥
অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম।
মোক্ষ ফল কেবল কৈবল্য হরিনাম॥
অন্য অন্য ফল পাবে ভজ অন্য জনে।
মোক্ষপদ পাবে যদি ভজ নারায়ণে॥
নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার।
সত্ত্ব রজ তমোগুণ প্রকৃতি তাঁহার॥
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়।
তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময়॥
সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়।
যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয়॥
তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে।
মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকে॥
সত্ত্বগুণে তত্ত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি।
অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি॥
সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্ব্বদেবে হরি॥
বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে।
আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে॥
এত শুনি শৌনকাদি লাগিলা কহিতে।
কি কহিলা ব্যাসদেব না পারি সহিতে॥

ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তমঃ বিনা নয়।
নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময় ॥
তমোগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে।
অহঙ্কার নহিলে কি ভেদ ব্রহ্ম জীবে ॥
সত্ত্ব রজঃ প্রভাব ক্ষণেক বিনা নয়।
তমর প্রভাব দেখ চিরকাল রয় ॥
রজোগুণে সৃষ্টি তাহে কেবল উদ্ভব।
সত্ত্বগুণে পালন বিধির উপদ্রব ॥
তমোগুণে প্রলয় কৈবল্য পরিণাম।
বুঝহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার নাম ॥
রজোগুণে কৌমার যৌবন সত্ত্বগুণে।
তমোগুণে জরা দেখ শুক্র কোটিগুণে ॥
রজোগুণে বিধি তার নাভিতটে স্থান।
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর হৃদয়ে অধিষ্ঠান ॥
তমোগুণে শিব তার ললাটে আলয়।
ভাবি দেখ তমোগুণ কত উচ্চ হয় ॥
তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ।
তথাপি এমন কহ এবড় অজ্ঞান ॥
সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায়।
তোমার এমন কথা এত বড় দায় ॥
এই কথা কহ যদি কাশী মাঝে গিয়া।
তবে সবে হরি ভজি হরেরে ছাড়িয়া ॥
এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে।
বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

মেঘনাদ-বধ

ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।

কতক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথা
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি ;—
"কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব আশীর্ব্বাদে
চিরদাস ! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে।
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মূঢ় আমি ? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব ; মহোরগ যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে !
পশিল কাননে দাস ; আইল গর্জ্জিয়া
সিংহ ; বিমুখিনু তাহে ; ভৈরব হুঙ্কারে
বহিল তুমুল ঝড় ; কালাগ্নিসদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ; পুড়িল চৌদিকে

বনরাজি ; কতক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে।
সুরবালাদলে এবে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী ; কৃতাঞ্জলি-পুটে,
পূজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে।
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কহিলেন দয়াময়ী,—'সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি। দেব অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি ! বিভীষণে লয়ে,
যা চলি, নগর-মাঝে ; যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ্ তারে। মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; পিধানে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয়হৃদয়ে
যা চলি, রে যশস্বি !'—কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি ! পোহায় রাতি ; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব ! দেহ আজ্ঞা দাসে।"
উত্তরিলা রঘুনাথ ;—"হায় রে কেমনে—
যে কৃতান্ত-দূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে ;—

কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে ;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে ;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে ; শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে !
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল
অন্ধকারঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে ?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট ! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি ? থাকি এ সংসারে ?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।"
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী ;—
"কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত ? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে ? দেবকুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব ; কৈলাসনিবাসী
বিরূপাক্ষ ; শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী !
দেখ চেয়ে লঙ্কাপানে ; কালমেঘসম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে ! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু ! আদেশ দাসেরে,
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ;

অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদ-প্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা ? ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্ম কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি ?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙ্গে পদাঘাতে ?"
কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র ;—"যা কহিলা সত্য, রাঘবেন্দ্র রথি !
দুরন্ত কৃতান্ত-দূতসম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী ; শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী,—'হায় ! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ ! এ পাপসংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি ? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল ? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা ? কিন্তু তোর্ পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর ; পাইবি
শূন্য রাজ সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই ! রক্ষঃকুলনাথ পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি ! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি
তুই তার। দেব-আজ্ঞা পালিস যতনে,
রে ভাবী কর্ব্বুররাজ !—'উঠিনু জাগিয়া ;-
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু ;

স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে,
মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী!
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপা
কবরী; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি;—মরি
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা! বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মনঃ দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে
দেবাদেশ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে!"

উত্তরিলা সীতানাথ সজলনয়নে;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে?
হায় সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দ্দয়; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে!
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা! উচ্চ অবরোধে
কাঁদিলা উর্ম্মিলা বধূ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব!

না মানিল অনুরোধ ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা,—'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই, রাঘব ! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে।
সঁপিনু এ ধন তোরে, রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'
"নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে ! দুর্ব্বার সমরে,
দেব-দৈত্য নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি !
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র ; বিশারদ রণে
অঙ্গদ সুযুবরাজ ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা ;
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতুসম
অগ্নিরাশি ; নল, নীল ; কেশরী—কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর ; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য ; তুমি মহারথী ;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে ? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি সখে, এ রাক্ষস পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।"
সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে ;—
"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য ? দেবকুলপ্রিয়
তুমি। দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ?

দেখ চেয়ে শূন্যপানে।" দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে,
ভৈরব আরবে দেশ পূরিছে চৌদিকে!
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,
হলাহল! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা, ঘোষিল
উথলিয়া জলদদল। কতক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখিবর পড়িলা ভূতলে;
গরজিলা অজগর—বিজয়ী সংগ্রামে।
কহিলা রাবণানুজ;—"স্বচক্ষে দেখিলা
অদ্ভুত ব্যাপার আজি; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে!
নহে ছায়াবাজী ইহা; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে;—
নির্বারিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী!"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

LAGHUMANJARÍ

OR

ELEMENTS OF SANSKRIT GRAMMAR

(Intended for the Entrance and Preparatory Classes.)

Price—One Rupee.

Opinions of Savants.

1, AUCKLAND VILLAS, DARJEELING.
31st August, 1887.

Professor Tawney thus observes :—

I should think your Book Laghumanjarí would be very useful to Entrance-candidates. * * * I like the combination of European and Indian systems. I think our University-students should be familiar with both.

ON TOUR. SASSERAM.
1st November, 1887,

Mr. Pope Writes :—

Many thanks for your Laghumanjarí. I like it much and have introduced it in the first three classes of the H. C. Schools in my circle (Behar Circle).

ARCADIA, DEOGHUR.
28th September 1887.

Dr. Rajendra Lala Mitra, C.I.E., says—

I have to thank you for your book (Laghumanjarí). I am sure it must be good, though I have had no time to look into it yet. I do feel strongly that a compendious text-book is greatly needed.

Manimanjari—A Sanskrit Grammar with English Explanations.

For FA and BA Classes.

Price— Re. 1.

Sáhitya Parichaya, Part I.

(Intended for Junior Classes of a Higher Class School)

Price— 8 Ans.

Key to Sáhitya Parichaya, Part I.

Price— 6 Ans.

Sáhitya Parichaya, Part II.

(Intended for Higher Classes.)

Price— 12 Ans.

BY

NILAMANI MUKERJEA, M.A.,
Professor of Sanskrit, Presidency College,
Fellow of the Calcutta University,
Member of the Asiatic Society of Bengal.
&c. &c.

BEHARILAL CHAKRAVARTI,

SAHACHAR OFFICE,
8, *Dixon's Lane, Calcutta.*

Printer and Publisher